ললিত পয়ার

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্রয়কেন্দ্র
প্রভা প্রকাশনী
স্টল নং—৪৩
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

"LALITA PAYAR"

প্রকাশক
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া * নোনাচন্দনপুকুর

প্রথম প্রকাশ : রাখি-পূর্ণিমা, ১৯৬১

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০৬

বারান্দার ঘড়িতে সশব্দে দুটো বাজল।

ওয়াল ক্লকের গুরুগম্ভীর শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সুজয়। চেয়ার থেকে নিজের শরীরকে একরকম ছিনিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একইভাবে বসে সে লিখে চলেছে। ছোট একটি গল্প লেখার পরিকল্পনাই তার ছিল। আরম্ভ করবার সময় তাই বড় ছকে বাঁধেনি, কিন্তু লিখতে লিখতে গল্প ক্রমে নভেলেটের আকার নিচ্ছে। আগেও বহুবার এরকম হয়েছে।

ঘরের বড় আলো নেভানো।

টেবিল ল্যাম্পে হাল্কা-পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। তার হাল্কা আলোয় ঘরখানা মায়াময় রূপধারণ করেছে। মিনিট দুয়েক সুজয় একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল চেয়ারের হাতল ধরে। তারপর উত্তরের খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার উপর আছড়ে পড়ল।

'সুজয়ের প্রতিটি তন্ত্রী শিরশিরিয়ে উঠল যেন।

হেমন্তের গহন রাত।

চাঁদ দেখা যাচ্ছেনা। পশ্চিমের আকাশে বেশ হেলে পড়ায় গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য। তবে তার ফ্যাকাশে হলদে আলোয় আকাশ ছেয়ে রয়েছে। এমনি কত রাত লিখতে লিখতে কাবার করে দিয়েছে সুজয়। লেখার নেশায় এমন বুঁদ হয়ে থেকেছে যে কখন ভোর হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি।

অবশ্য এই পরিশ্রম তখনই সার্থক যখন কাহিনী সুষ্ঠু রূপ নিয়ে এগিয়েছে সমাপ্তির দিকে। প্রথম প্রথম একনাগাড়ে এত দীর্ঘ-সময় লেখার জন্য ব্যয় করতে পারত না। অস্বস্তি ক্রমেই শরীরকে পেঁচিয়ে ধরত। মনে নামত গভীর অবসাদ। অভ্যাসের গুনে এখন আর ও সমস্ত বিকারের বালাই নেই।

সঞ্জয় সিগারেট ধরাল।

কালচে হলদে রং এর ধোঁয়া মুখের সামনে কুয়াশার সৃষ্টি করেই সরে যেতে লাগল। আগে এই ঘরের জানলা দিয়ে গ্লাস ফ্যাক্টরীর কিছু অংশ দেখা যেত। অবশ্য তার অবস্থান বেশ কিছু দূরে, তবুও দেখা যেত। এখন আর দেখা যায় না। মাঝের অংশে কিছু বাড়ী হয়েছে। তাছাড়া অসংখ্য গাছ উঠেছে মাথা চাড়া দিয়ে।

সঞ্জয় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে টেবিলের দিকে ফিরে তাকাল। এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ধপধপে সাদা কাগজের উপর কালো অক্ষরগুলি। লিখতে সে আজ আরম্ভ করেনি, আঠারো বছর পূর্ণ হবার আগেই তার প্রথম গল্প খাতার পাতায় রূপ নিয়েছিল কালির আখরে। তারপর কত বছর গড়িয়ে গেছে। যশ, অর্থ সবই পেয়েছে সঞ্জয়। আবার ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই সাহিত্য সাধনাই তাঁর জীবনে কম বিড়ম্বনা আনেনি।

জানলার কাছ থেকে সঞ্জয় সরে এল।

এসে বসল নিভাঁজ বিছানার উপর। এই সমস্ত একান্ত অবকাশে অতীতের কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে যায়। ইচ্ছা করে মন্থর ভঙ্গীতে রোমন্থন করে নিজের অতীতের দিনগুলিকে। কেন যে এমন ইচ্ছা হয় সে নিজেও তা জানে না।

বলতে গেলে আজীবন সঞ্জয় বিহারেই আছে। রূপোর চামচ মুখে নিয়েই সে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিল। আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। দীর্ঘ-অপেক্ষার পর এই শিশুর আগমন। স্বামী-স্ত্রী সন্তানের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। চিকিৎসক-বর্গও বুঝে উঠতে পারছিলেন না শারীরিক সমস্ত যন্ত্র সচল থাকা সত্ত্বেও কেন এরকমটা হচ্ছে।

কিন্তু আনন্দ দীর্ঘ স্থায়ী হল না। মাত্র মাসখানেক পরে সঞ্জয়ের মা চিরদিনের মত চোখ বুজলেন। শরীর দুর্বল ছিলই, বাথরুমে পিছলে পড়ে গুরুতর আহত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে-

ছিলেন। জ্ঞান আর তাঁর ফিরে আসেনি। আনন্দ ঝলমল বাড়ী শোকের সাগরে ডুবে গেল।

সুদেববাবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লেও, নবজাতককে অপয়া মনে করলেন না। এই ক্ষুদ্র প্রাণটিকে তার জননীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করা চলে না। শোকের বেগ সামলে নেবার পরই তিনি ছেলের সুষ্ঠু লালন পালনের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

সুদেববাবু ব্যস্ত মানুষ। ট্যানারির তাঁর ফলাও কারবার। ব্যবসা উপলক্ষ্যেই প্রায়ই ভারতের নানা প্রান্তে যাওয়া আসা করতে হয়। কাজেই প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, সুজয়কে রাখবেন দিদির বাড়িতে। পরে আবার কি ভেবে বাড়িতেই আয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন। অবশ্য তিনি কিভাবেই বা জানবেন তাঁর প্রথম চিন্তা একসময় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে বাস্তবে রূপ নেবে।

সুজয় বড় হতে লাগল।

ইতিমধ্যে দিদি নীহারিকা বহুবার ভাইকে অনুরোধ করেছেন আবার বিয়ে করতে। যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী বয়েসে বৌ মরলে লোকে বিয়ে করে। এই ভাবে নিজের প্রতি দিনের পর দিন অবিচার করার মানে হয় না। দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কয়েকজনের নাম করেছেন। এদের অনেকের তো এক গণ্ডা করে ছেলেপুলে তাই বলে কি এরা বিয়ে করেনি।

দিদির কথা শুনে প্রথম প্রথম সুদেববাবু শুধু হাসতেন। উঠে চলে যেতেন ব্যস্ততার ভান করে। ও প্রসঙ্গে নিজের মতামত দেবার কোন আগ্রহই বোধ করতেন না। শেষে উত্ত্যক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হলেন, সকলের রুচী এক নয়। কেউ এক গণ্ডা ছেলেপুলে থাকা সত্ত্বেও আবার বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে—আবার কেউ কেউ বয়স লুকিয়ে, পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে জোড় পরে পিঁড়িতে গিয়ে বসে। আমি এ সমস্ত কথা জানি দিদি। আবার আমার মতও দু-চার জন আছে যারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সংসারে ঝামেলা

ডেকে আনার চেয়ে একটি মাত্র ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করে তোলা বাঞ্ছনীয় মনে করে।

কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি।

মানুষ করে যেতে পারেন নি ছেলেকে।

ব্যবসা উপলক্ষ্যে সুদেববাবু দিল্লী গিয়েছিলেন। ব্যস্ততার দরুন প্রতিবারের মত এবারও নিয়মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। ঠাণ্ডাও লেগে গিয়েছিল। শরীরে ম্যাজ ম্যাজে ভাব থাকলেও মোটামুটি তিনি ওখানে সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ফেরার পথে ট্রেনে তেড়ে জ্বর এল। এবং হাজারিবাগে পা দেবার মাত্র কয়েকদিন পরে চিকিৎসকদের হতবাক করে দিয়ে মারা গেলেন।

সুজয়ের বয়স তখন মাত্র আট বছর।

সে সমস্ত দিনের দৃশ্য ঝাপসা ভাবে এখনও সুজয়ের চোখের উপর ভেসে ওঠে। আর্থিক সঙ্গতি দৃঢ় ভিত্তিতে বাঁধা থাকলেও সে দারুণ অসহায় হয়ে পড়ল। নিজের বলতে ওই বিশাল বাড়ীতে তার আর কেউ রইল না! কি ভাগ্য নিয়েই সে এই দুনিয়ায় এসেছিল!

ভাই এর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই নীহারিকা নিজের বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাজারিবাগে চলে এলেন। প্রচুর কান্নাকাটি করলেন। সমস্ত বাড়ী পরিক্রমা করে আক্ষেপ করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রাদ্ধ চুকে গেল। তারপর কলকাতা থেকে সুদেববাবুর এটর্নী এলেন। বছর দুয়েক আগে তিনি উইল করেছিলেন। সেই উইলের মূল কথা জানাবার জন্যই এটর্নীর আগমন।

জানা গেল, তাঁর যাবতীয় যা কিছু আছে সমস্তই তিনি নিজের একমাত্র ছেলেকে দিয়ে গেছেন। অবশ্য সে সাবালক হবার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তবে তাঁর দিদি নীহারিকাদেবী এবং তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পংকজ চৌধুরী সুজয়কে দেখাশুনা করবে। খরচ খরচার জন্য প্রতিমাসে ছশ টাকা দেওয়া হবে। ব্যাংকে সে রকম ব্যবস্থা করা আছে। প্রয়োজন বোধে বসত বাড়ি ভাড়াও দেওয়া চলতে পারে

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই ব্যবস্থায় সপুত্র নিহারিকার পুলকিত না হবার কোন কারণ নেই। ধনাঢ্য ভাইপোকে সাবালক করে তোলার দায়িত্ব সানন্দে তিনি নেবেন। ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে সুজয় রাঁচিতে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থা সুজয়ের কিশোর মন ভালভাবে গ্রহণ করেনি। তবুও আপত্তিতে সোচ্ছার হয়ে ওঠেনি। বাবা যখন চলে গেছেন তখন এঁদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তো উপায় নেই।

রাঁচিতে অবশ্য তার আদর যত্নের অভাব হল না।

দিন গড়িয়ে চলল।

লেখাপড়ায় প্রচণ্ড ভাল কোনদিনই সুজয় ছিল না। তবে বছরের পর বছর কোন ক্লাসের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়নি তাকে। কোন রকমে পাশ করে গেছে প্রতি বছর। শেষে ম্যাট্রিকের দরজায় সেকেণ্ড ডিভিসনের প্রণামী দিয়ে সে প্রবেশ করল কলেজে। পিসিমা ও পিসতুতো দাদা চেয়েছিলেন সে সায়েন্স পড়ুক, বলাবাহুল্য সুজয়ের ঝোঁক আর্টসের দিকে।

স্বভাবতই সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির। এই কারণেই বোধহয় দীর্ঘ স্কুল জীবনে তার সঙ্গে কারুর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। গড়ে না ওঠার অন্যকারণও অবশ্য আছে। সে মাঠে ঘাটে গিয়ে হৈ-হল্লায় কখনই আর সকলের সঙ্গে গলা মেলায়নি। পরের বাগানে ঢুকে ফল-পাকুড় তুলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কোন প্রবৃত্তি তার ছিল না। কাজেই বন্ধুত্বের হাত তার দিকে কে এগিয়ে ধরবে?

কলেজে ঢুকে সুজয় নিজেকে আরো গুটিয়ে নিল। তার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতে লাগল ওখানকার বিরাট লাইব্রেরীতে। আড়ালে আবডালে অধিকাংশ ক্লাস মেট তার সম্পর্কে যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করে আনন্দ পেত না, তা নয়। অবশ্য মতিলাল এই দলে ছিল না। তার প্রকৃতি একটু অন্য ধরনের।

একদিন সে বলতে গেলে যেচে আলাপ করল সুজয়ের সঙ্গে।

লাইব্রেরীতেই দুজনের আলাপ হল। মতিলালের ঝোঁক ইতিহাসের দিকে। সেও নিয়মিত আসত লাইব্রেরীতে। এই বেহারী ছেলেটিকে খুব ভাল লেগে গেল সুজয়ের। আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল। ছুটি ছাটাতে শহর থেকে দূরে কোন নির্জন জায়গায় দুজনে চলে যেত। কয়েক ঘণ্টা ভবিষ্যতের জল্পনায় দুজনে নিজেদের গভীর ভাবে ব্যস্ত রাখত।

মতিলাল রাঁচির ছেলে নয়। সুদূর মুঙ্গের থেকে এসেছে। অবশ্য মুঙ্গের শহরের অধিবাসী তারা নয়। ওই জেলার মধ্যে শহর থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে পাটনা জেলার গা ঘেঁসা ছোট্ট জনপদ বারবিঘা। ওখানকার অধিবাসী মতিলাল। মতিলালের বাবা ওখানকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, অনেক জমিজমা আছে। পাটনা, মুঙ্গের বা ভাগলপুর কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও কেন যে সে এতদূরে পড়তে এসেছে সুজয় বুঝতে পারে না।

একদিন প্রশ্ন করল, আচ্ছা, তুমি এখানে পড়তে এলে কেন?

মৃদু হেসে মতিলাল বলল, কেন এলাম তা শুনলে তুমি হাসবে।

—তবু শুনি?

—কবিতা লেখার জন্যে।

—কবিতা !!!

—হ্যাঁ। যাতে বাধাহীন ভাবে কবিতা লিখতে পারি, তার জন্যে অনেক ফন্দিফিকির করে এখানে পড়তে আসার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। বুঝিয়ে বলবে কি?

—কেন বলব না? আসল কথা হল, আর দশজন গার্জেনের মত বাবাও চান আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করি। ছেলে কবিতা লিখে সময় অপচয় করবে তা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। অথচ—

—অথচ তুমি কবিতা না লিখে থাকতে পারবে না!

—ঠিক বলছো। তাই অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে বাবার নাগালের বাইরে চলে এসেছি। পাটনা, মুঙ্গের বা ভাগলপুরে তাঁর যাতায়াত আছে, এখানে নেই।

সুজয় বলল, কিন্তু আমাকে তো একদিনও বলনি তুমি কবিতা লিখতে পার ?

—কি আর এমন আহামরি ব্যাপার যে বলব ? কাল তো ছুটি। হোস্টেলে এস। তোমাকে আমার কবিতা পড়ে শোনাব।

—খালি লিখে গেলে হবে না কিন্তু। ছাপার ব্যবস্থাও করা চাই। ও সম্পর্কে কিছু ভেবেছো ?

—আমার কবিতা তো ছাপা হয়। তোমাকে নিয়ে যেটা লিখেছি, আগামী সপ্তাহের "ধর্মযুগে" প্রকাশিত হবার কথা আছে।

—বলকি ! আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছো ?

—বিশ্বাস কর সুজয়, চমৎকার হয়েছে।

—তোমাব ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মতিলাল। এত সমস্ত গুণ নিয়ে বেশ চেপেচুপে আছো তো !

—এ আর এমন কি ? ইচ্ছে করলে তুমিও পার।

—আমি কবিতা লিখব তাহলেই হয়েছে।

গল্প !

সুজয় অবাক হয়ে যায়।

মতিলাল কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলে, তোমার কথাবার্তা বলার ভঙ্গী মনোরম। দ্রুত লিখতেও পার। আমার মনে হয় তুমি পারবে।

—কি জানি, কখনও তো চেষ্টা করে দেখিনি।

—আরম্ভ করে দেখই না কি হয়।

সুজয় একটু চিন্তা করে বলল, গল্প পড়তে পড়তে কখন যে গল্পকার হবার ইচ্ছে হয়নি একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে—

—তাইতো বলছি চেষ্টা করে দেখ না।

—তোমার কথায় বেশ উৎসাহ পাচ্ছি। চেষ্টা করে দেখব আমার কলম দিয়ে গল্প বেরোয় কিনা।

এরপর সুজয় কয়েকদিন ধরে চিন্তা করল প্লট নিয়ে।

শেষে মন কেন্দ্রীভূত হল প্রেমের গল্পের উপর। প্রেমের গল্পই লিখবে, তবে ব্যর্থ প্রেমের নয়—মিলনান্তক। কয়েকদিন ধরে ধীরে সে তার গল্প এগিয়ে নিয়ে চলল। গল্প শেষ হবার পরই স্বাভাবিক ভাবে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। তার ভবিষ্যত নিয়ে অনেক চিন্তা করতে হয়।

সুজয়ও অনেক ভেবে, অনেক ইতস্তত করে গল্পটা পাঠিয়ে দিল কলিকাতার বিখ্যাত এক পত্রিকা অফিসে। অবশ্য সে জানে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি প্রতিদিন ওখানে যাচ্ছে। তার অর্দ্ধেকও সম্পাদক বা তাঁর সহকারীরা পড়ে দেখা দূরের কথা, নেড়েচেড়ে দেখেন কিনা সন্দেহ। দোষ অবশ্য দেওয়া যায় না, তাঁদের কত কাজ। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে তার গল্প নিঃসন্দেহে হারিয়ে যাবে, তবু পাঠাল।

মাসখানেক কেটে গেছে এরপর।

সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপারের সুজয় মুখোমুখি হল। পড়ার ঘরের টেবিলের উপর একটা চিঠি রাখা ছিল। বাড়ীর কেউ নিশ্চয় এখানে রেখে গেছে। তার জীবনে চিঠি বড়ই দুর্লভ। কেই বা তাকে লিখবে। দ্রুত হাতে খাম ছিঁড়ে তার মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করল।

একি! বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। তার গল্প মনোনীত করেছেন সেই বিখ্যাত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। এরকম অসম্ভব ব্যাপারও দুনিয়ায় আজও ঘটে! চিঠিখানা বার বার পড়ল সুজয়। এত আনন্দিত জীবনে বোধহয় সে আর কখন হয়নি। তখনই ছুটল মতিলালকে সংবাদ দিতে। সেও কিছু কম আনন্দিত হবে না।

সন্ধ্যাটা দুজনের ভালই কাটল।

রাত্রে খাবার সময় নীহারিকা প্রশ্ন করলেন, কলেজ থেকে ফিরে জলখাবার না খেয়ে কোথায় বেরিয়েছিলে ?

—মতিলালকে জানতো। তার কাছে গিয়েছিলাম পিসিমা।

—সারা দুপুর একসঙ্গে থেকেও মন ভরেনি।

সুজয় হেসে বলল, তা নয়। ওকে একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। তুমি শুনলেও খুশী হবে। "বসুমতীতে" আমার একটা গল্প বেরুচ্ছে।

শুনে মোটেই খুশী হলেন না নীহারিকা।

অপ্রসন্ন গলায় বললেন, আজকাল এই সমস্ত হচ্ছে। এ সব তো ভাল কথা নয়। কলেজের ছেলের কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা।

—আমি তো লেখাপড়ায় ফাঁকি দিই না পিসিমা।

—গল্প লেখার ভূত যখন তোর মাথায় চেপেছে তখন ফাঁকি তোকে দিতেই হবে। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু আর ওসব নয়।

পিসিমার কথাগুলে মোটেই ভাল লাগল না সুজয়ের। সে অবশ্য কোন প্রতিবাদ করল না। নীরবে আহার সেরে উঠে গেল। তবে এটা ঠিক সে গল্প লেখা কখনই ছাড়বে না।

গল্প প্রকাশিত হল তিন মাস পরে। কলেজে যে একেবারেই আলোড়ন উঠল না তা কিন্তু নয়। সে নিজে কিছু বলেনি। মতিলালই এই সংবাদ ছড়িয়ে দিল। ওই সংখ্যার "বসুমতী" সকলের হাতে হাতে ফিরতে লাগল। সহপাঠীরা কেউ ধারণাই করতে পারেনি সুজয়ের গল্প লেখার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা যে আছে তাতে এখন আর সন্দেহ করা চলে না। তাছাড়া গল্পটি নিঃসন্দেহে সুলিখিত নইলে ওই বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান হত না।

বাড়িতে কিন্তু এই ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

পিসিমা আগে থেকেই অপ্রসন্ন ছিলেন। এখন তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠল। তাঁর দৃঢ় অনুমান হল, এখন সে

দারুণ উৎসাহিত হয়ে, কলেজের পড়া জলাঞ্জলি দিয়ে গল্প লেখার দিকে ঝুঁকবে। পিসতুতো দাদা অম্বুজ চৌধুরীও বিশেষ বিরক্ত হলেন। নাটক নভেল লিখে ছেলেটা এখন থেকে উচ্ছন্নে যাবে বলে নয়, বিশেষ এক কারণে শুধু বিরক্ত ছাড়াও কিছুটা শঙ্কিত হলেন। বৌদি এবং ভাইপো ভাইঝিদের চোখে কিন্তু সুজয় একজন কেউকেটা রূপে প্রতিভাত হতে লাগল।

প্রাচীন পন্থী ও অম্বলের রুগী পিসিমা ও বদরাগী অম্বুজদাকে নানা কারণে আজকাল সে ভাল চোখে দেখে না। তাঁরা কি মন্তব্য করলেন তা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথাও নেই। নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে তার কলম নীরব রইল না। একের পর এক গল্প লিখে চলল। যথানিয়মে সেগুলি প্রকাশিত হতে লাগল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

দেখতে দেখতে দেড়টি বছর কেটে গেল আরো।

গল্প লেখার বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেও, সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। পরীক্ষার কথা সুজয়ের মনে ছিল--ক্লাসে নোট নিতে এবং যথা সময় তার উপর চোখ বুলিয়ে যেতে কসুর করেনি। সময় কারুর জন্য বসে থাকে না। ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল! এবং উত্তেজনার মধ্যে শেষও হল একদিন।

সুজয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্য শেষ হবে না, তবে, বি. এ. পাশ করতে পারুক আর নাই পারুক, কলেজের মুখো আর হচ্ছে না। এ তো লেখাপড়া শেখা নয়, ডিগ্রী অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তার কি লাভ অবিরাম ডিগ্রীর বোঝা ঘাড়ে চাপাবার জন্য পরিশ্রম করার? বরং সেই সময় সাহিত্যের জন্য খরচ করলে অনেক লাভ হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

পাঠক মহলে এখন সে পরিচিত মোটামুটি। চাহিদা বেড়েছে বেশ। গল্পের জন্য সম্পাদকরা প্রায়ই পত্রাঘাত করেন। ধারাবাহিক

উপন্যাসও লিখছে এক জায়গায়। সুতরাং এখন আর অন্যদিকে মন দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন শুধু নিদারুণ একাগ্রতায় ভাল লেখার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

পরীক্ষা শেষ হবার এক সপ্তাহ পরে সুজয় কলকাতা চলে গেল।

অবশ্য যাওয়ার ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে হয় নি।

নীহারিকা আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন, ওই বিরাট শহর সুজয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাছাড়া ওখানে এমন কেউ নেই, যার ওখানে উঠতে পারবে, ইত্যাদি। সে যুক্তি দেখিয়েছে, যাওয়া আসা করলেই অপরিচিত জায়গা পরিচিত হয়। তাছাড়া রাঁচির বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে সে কথাও তাকে জানতে হবে। এরপর সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। বলেছে, আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড মতিলালদের কলকাতায় বাড়ি আছে। থাকার কোন অসুবিধে হবে না।

সুজয়ের কলকাতা যাবার ব্যাপারে অম্বুজ চৌধুরীরও বিশেষ আপত্তি ছিল। এটর্নী রেবতী দাসগুপ্তর সঙ্গে তার একান্তে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটা ওঁর একেবারেই অভিপ্রেত নয়। অবশ্য কলকাতা বিরাট শহর, হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা অল্প। তাছাড়া সুজয় তাঁর ঠিকানা জানে না। সাত-পাঁচ ভেবে যাওয়ার অনুমতি তাঁকে দিতে হল এবং একশ টাকা রাহা খরচও।

সামান্য একশ টাকা কলকাতা বেড়ানোর পক্ষে যে কিছুই নয় সুজয় তা ভাল ভাবেই জানে। তবুও বেশি টাকার জন্য পিড়াপীড়ি করল না। কারণ এরা না জানলেও তার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে। এতদিন গল্প লিখে যা উপার্জন করেছে তার সবটাই এসেছে মতিলালের ঠিকানায়, এরা কিভাবে জানবে সে কথা ?

সুজয়কে ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিল মতিলাল।

আগামীকাল সেও বাড়ী ফিরবে।

কথায় কথায় মতিলাল প্রশ্ন করল, কলকাতায় তুমি উঠবে কোথায় ? কোন সম্পাদকের বাড়ি নাকি ?

—না। বাবার এটর্নী মিঃ দাশগুপ্তর বাড়ি। আমার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হবার আগে সংকটের মুখোমুখি যাতে দাঁড়াতে না হয়, তাই চলেছি তাঁর কাছে।

—আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে ?

—এরা আমাকে দারুণ ভাবে ঠকাবার ব্যবস্থা করছে তা তুমিও আন্দাজ করতে পার। এটর্নী দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে এখানে এসে আমার খোঁজ-খবর নিয়ে যান। তখন বাড়ির সকলে তাঁকে আগলে রাখেন, আমার সঙ্গে একান্তে তার যাতে কথা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। তবুও এবার আমাদের দুজনের একান্তে দেখা হয়েছিল। তিনি পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন বলেই নিজের ঠিকানাটা দিয়ে গেছেন আমায়।

—তুমি কি—

—এখন ডেসপারেটলি কিছু করব না। উইলের নির্দেশ অনুসারে আরো একটা বছর ওই বিরক্তিকর পরিবেশে আমায় কাটাতে হবে।

—তারপর ?

—মোট কথা পড়াশুনা আমার শেষ হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েট হতে পারি ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। হাজারিবাগের বাড়ি থেকে ভাড়াটে তুলতে হবে। বাকী জীবন ওখানে থেকে সাহিত্য চর্চা করে কাটিয়ে দেব।

মৃদ হেসে মতিলাল বলল, ভবিষ্যতের কথা এখুনি এত জোরের সঙ্গে বলা চলে না।

—তা অবশ্য। তুমি কি করবে ঠিক করলে ?

—পাশ করলে চাকরীর সন্ধান দেখব। আর যদি ফেল করি তাহলে আরেকবার চেষ্টা করব পাশ করার।

—ধর, পাশও করলে আর চাকরীও পেলে, তখন কি করবে ?

—তখন ? চাকরী করব আর কবিতা লিখব।

দুজনে হেসে উঠল এক সঙ্গে।

রেবতীবাবু কলকাতার চক্রবেড়িয়া রোডে থাকেন। বেশ বয়স হয়ে গেছে। এখন আর ব্যাংকসাল ষ্ট্রীটে তাঁর এটর্নী ফার্মে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে পারেন না। বড় ছেলেই ব্যবসা দেখাশুনা করে। নামকরা ফার্ম। জাঁদরেল মক্কেল আছে অনেক। কাজই তাঁর অনিয়মিত উপস্থিতিতে ব্যবসায় ভাঁটা পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

জীবনে কখনও কলকাতায় পা না দিলেও চক্রবেড়িয়া রোড খুঁজে বার করতে সুজয়ের খুব বেশী অসুবিধা হল না। অভাবনীয়ভাবে তাকে কাছে পেয়ে রেবতীবাবু বিশেষ খুশী হলেন। এই অভাগা ছেলেটির জন্য তাঁর মনে অনেক করুণা সঞ্চিত আছে।

বাড়ীতে লোকজনের আধিক্য না থাকায় সুজয়কে বিশেষ সংকুচিত হতে হল না। বাড়ীর আর সকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে নিজের করে নিতে চাইলেন।

দুপুরে আহার পর্ব সমাধা হবার পর তার সঙ্গে রেবতীবাবুর নানা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল।

এক সময় সুজয় বলল, আমি রাঁচির ওই জেলখানায় আর থাকতে পাচ্ছি না।

রেবতীবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

তিনি মনে মনে হিসাব করে বললেন, আমি জানি তুমি খুবই অসুবিধার মধ্যে আছো। কিন্তু আরো নটা মাস চোখকান বুজে ওখানে কাটাতেই হবে। তার আগে তো আইনের চোখে তুমি সাবালক হতে পাচ্ছ না।

—কিন্তু—

—অবশ্য তোমাকে জোর করে ধরে রাখার বাধ্যবাধকতা উইলে কিছু নেই। সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে শুধু সাবালক হবার পর।

—তাহলে তো কোন অসুবিধাই রইল না। আমি তাহলে স্বচ্ছন্দে হাজারিবাগের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারি। আপনি

ভাড়াটেকে তোলবার ব্যবস্থা করে দিন।

—এত ঝামেলায় না গিয়ে তুমি এম. এ. পড়াবার জন্য কলকাতার হোষ্টেলে এসে থাক না। তাহলেই তো ওদের আওতার বাইরে থাকা হবে।

—আমি বি. এ. পাশ করতে পারব কি না সন্দেহ। তাছাড়া ফারদার আমার আর পড়ার ইচ্ছে নেই। সাহিত্যের দিকেই আমি বেশী করে নজর দিতে চাই। আপনি হাজারিবাগের ব্যাপারটা একটু দেখুন।

চিন্তিত গলায় রেবতীবাবু বললেন, তোমার যা-কিছু আছে তার তত্ত্বাবধায়ক এখন তোমার পিসিমা। হাজারিবাগের বাড়ীর ভাড়াটেকে তোলার চেষ্টা করতে গেলে আইন আমার বিপক্ষে যাবে। ঠিক আছে, আমি চিন্তা করে দেখি অন্য ভাবে কিছু করা যায় কি না।

রাত-ভোর ট্রেনের ধকল গেছে। তুমি এখন বিশ্রাম কর।

দিন চারেক পরে অম্বুজ চৌধুরী চিন্তার পাহাড় ঘাড়ে নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। সুজয়ের কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি পেয়েছেন। চিঠির সারমর্ম হল তাঁদের কাছে রাঁচিতে সে ফিরে যাচ্ছে না। এই সংবাদ স্বাভাবিক ভাবেই বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মত। বুড়ো এটর্নী সুজয়কে কি কুপরামর্শ দিয়েছে কে জানে? কাজেই হন্তদন্ত হয়ে তাঁকে ছুটে আসতে হল কলকাতায়।

তাঁকে দেখে সুজয় মোটেই অবাক হল না। এরকম কিছু একটা যে ঘটবে তা সে ধারনাই করে নিয়েছিল। তবে রেবতীবাবুর মনে বিস্ময় জাগল। এই ভদ্রলোক বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই যে এখানে এসেছেন তা মনে হয় না। সুজয়ের চিঠি দেওয়ার কথা তিনি জানতেন না।

কোন ভূমিকা না করেই অম্বুজ চৌধুরী বললেন, দেখুন দেখি

ব্যাপারখানা, আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে আর পড়বে না।

—তাই নাকি—

—দেখুন না—

তিনি পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে এগিয়ে ধরলেন।

রেবতীবাবু চিঠি পড়ে বললেন, তাইতো—

—এসবের কোন মানে হয়। আপনি তাকে কোন পরামর্শ দেননি তো ?

—আমি! এ সমস্ত কি বলছেন ? আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি। জিজ্ঞেস করে দেখুন সে কি বলে। তবে নতুন করে আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সুজয়ের ভালর দিকটা দেখাই হল আমার এক মাত্র স্বার্থ।

তিনি ঘর থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন।

সুজয় কাছাকাছিই ছিল। সে ঘরে প্রবেশ করল।

ভ্রূ কুঁচকে অম্বুজ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, আমাকে এখানে কেন ছুটে আসতে হল জানো ?

—না।

—তোমার চিঠিখানার জন্যে। একেবারে মনস্থির করে ফেলেছো ?

—হ্যাঁ।

—কারণ একটা আছে নিশ্চয় ?

—পড়তে আর ভাল লাগছে না।

—তোমার মত আহম্মক ছেলে আমি দুটি দেখিনি। কি করবে এখন ? গল্প লিখে আজীবন দু মুঠো অন্নের সংস্থান করা যায় না, এ কথা বোধ হয় তোমার জানা নেই।

জোরাল কোন কথা বলার ইচ্ছে সুজয়ের ছিল না। কিন্তু খোঁচটা বড় বেশী তীক্ষ্ণ বলে মনে হল। উপযুক্ত উত্তর না দেওয়ার আর কোন মানে হয় না।

গম্ভীর গলায় বলল, অন্নের সংস্থানের জন্য আমার চিন্তার তো

কোন কারণ থাকতে পারে না অম্বুজদা। সে ব্যবস্থা তো বাবা ভাল ভাবেই করে গেছেন।

ছোট ভাইয়ের মুখ থেকে এই ধরনের কথা অম্বুজ চৌধুরী আশা করেননি। তিনি কেমন দিশেহারা হয়ে পড়লেন। পরিস্থিতিকে কি ভাবে সামলান যায় এখন সেই পথ খুঁজে বার করতে হবে। সুজয়ের বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে তাঁর আয় হচ্ছে আশাতিরিক্ত। সে যতদিন নিজেকে লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারবে, তিনি ততদিন নিজের লাভের অংক বাড়িয়ে যেতে পারবেন।

কাজেই সুজয় কে এম. এ. পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য। গল্প লেখার এক উটকো আপদ দেখা দিয়ে তাঁর পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেবার উপক্রম করবে, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। অবশ্য বুড়ো এটর্নীরও কূট চাল এর মধ্যে থাকতে পারে। লোকটাকে কখনই ভাল বলে মনে হয়নি তাঁর।

কারণ যাইহোক, নিজের স্বার্থেই তাঁকে একটু নরম হতে হল।

তিনি বললেন, গল্প-উপন্যাস লেখা যে খারাপ এ কথা আমি বল্‌ছি না। তবে ওসব পড়াশুনা শেষ করার পর আরম্ভ করলেই ভাল হয়। দেখ না······

কোন উদাহরণ অবতারণা করার আগে সুজয় তাঁকে বাধা দিল।

—অনর্থক বছর বছর ফেল করেতো লাভ নেই। আমার বিন্দুমাত্র মন নেই পড়ায়। জোর করে কিছু করতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা।

—তোমার বাবা আমাকে তোমার গার্জেন করে গেছেন। আমার কথা শুনে চলা কি তোমার উচিৎ নয়?

এতদিন কি আমি আপনার কথা শুনিনি? এমন কি নিজের স্বার্থের উপর ঘা পড়ছে দেখেও তো চুপ করে থেকেছি।

—কি বলতে চাইছো?

—সে কথা আপনি শুনতে চাইবেন না।

—স্বার্থে ঘা দেওয়ার কথা যখন তুলেছো তখন আমাকে কথাটা শুনতেই হবে।

দৃঢ় গলায় সুজয় বলল, বেশ। আপনি আমাদের টেনারির ব্যবসাটা মানসুখলাল ভগবানদাসকে লিজ দিয়ে যে মোটা টাকা লাভ করেছেন রাঁচির সকলেই সে কথা জানে। হাজারিবাগের বাড়ি ভাড়ার টাকা প্রতিমাসে ব্যাংকে জমা দেবার কথা, বছরের পর বছর ধরে তা আপনি দেন না। আমি যখন আপনার কাছ থেকে সমস্ত বুঝে নেব তখন এই ধারাবাহিক গোঁজামিলের জট আপনি কি ভাবে ছাড়াবেন জানি না।

উলঙ্গ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অম্বুজ চৌধুরী হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। মুখচোরা, ভালমানুষ বলে যাকে এতদিন জানতেন সে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট সেয়ানা বোঝা যাচ্ছে। তিনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। এই হাঁসকে দিয়ে যে আর সোনার ডিম পাড়ান যাবে না তা বুঝলেন ভালভাবেই। কথা বাড়িয়েও নিজেকে আরো তলিয়ে দিতে চাইলেন না অম্বুজ চৌধুরী।

এ জায়গা আর তাঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

সুটকেশটা তুলে নিয়ে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুজয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এরপরের ইতিহাস অন্য রকম। সুজয় কলকাতায় থেকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করল রেবতীবাবুর কাছে। এখানে থাকলে পত্রিকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধা। বই প্রকাশের ব্যাপারেও অগ্রসর হওয়া যাবে। রেবতীবাবু সানন্দে রাজী হলেন। তবে সুজয় এবাড়ীতে থাকতে রাজী হল না। সে আলাদা বাসা ভাড়া নিতে চায়।

সবিস্ময়ে রেবতীবাবু বললেন, তোমার এখন যা আয় তাতে কি আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে তোমার থাকা সম্ভব হবে?

—না, তা সম্ভব হবে না।

—উইলের শর্ত অনুসারে তুমি এখন নিজের টাকাও পেতে পার না।

—তা আমার মনে আছে। আমি অন্যরকম পরিকল্পনা করেছি। এই আট মাস আপনি আমাকে প্রয়োজন মত ধার দিয়ে যাবেন। আমি সমস্ত হাতে পেলে আপনাকে শোধ করে দেব।

গলা ছেড়ে হাসলেন রেবতীবাবু।

—স্বাধীন ভাবে থাকতে চাইছো, আবার নিয়মিত তোমাকে টাকাও ধার করে যেতে হবে! অভিনব পরিকল্পনা। বেশ তাই হবে। টাকা আমি দেব।

রেবতীবাবুর চেষ্টাতেই থাকার জায়গা পাওয়া গেল বিবেকানন্দ রোডে। কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নয়, বাথরুম সংযুক্ত একটি মাত্র ঘর। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। গৃহকর্তা রেবতীবাবুর মক্কেল, বলতে গেলে সস্তাতেই তাই ভাল ঘরখানা পাওয়া গেল। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলে।

সুজয়ের স্বাধীন জীবন আরম্ভ হল।

অদ্ভুত এক অনুভূতিতে মনের প্রতিটি কোন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। এ না হলে জীবন? যা ইচ্ছে কর কেউ বলবার নেই, কেউ দেখবার নেই। অবশ্য শোভন নয় এমন কিছু সে করবে না। মতিলালকে বিস্তারিত ভাবে সমস্ত কিছু জানিয়ে চিঠি লিখেছে। রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন জানায়, একথারও উল্লেখ রেখেছে।

দিন গড়িয়ে চলল।

খুব মন দিয়ে লিখছে সুজয়। অনেকগুলি পত্রিকায় লেখা দিতে হবে। এক জায়গায় আবার ধারাবাহিক ঐতিহাসিক উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে। লিখতে লিখতে মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাত্রের শোতে সিনেমা দেখতে চলে যায়। কাউকে বিরক্ত না করেই নিজের আস্তানায় ফেরার কোন অসুবিধা নেই। রাস্তার উপরই তার ঘর। চাবি লাগিয়ে যেখানে খুশী যাওয়া যায়।

মাস চারেক নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যিকও তাকে প্রীতির চোখে দেখছেন। কেউই কিন্তু অনুমান করতে পারেন না সে এখনও একুশের কোঠা অতিক্রম করতে পারেনি। তার বাড়ন্ত শরীর দেখলে কখনই তা বুঝতে পারা যায় না। মনে হয় বছর ২৬/২৭ বয়স হবে।

ইতিমধ্যে অকল্পণীয় এক সংবাদ এসে পৌঁছেছে। মতিলালের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েও কথাটা সে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। কিন্তু রেজাল্ট পেপারের কাটিং সমেত চিঠি এসে যখন পৌঁছাল তখন আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। সুজয় পাশ করে গেছে। রেজাল্ট অবশ্য আহামরি কিছু নয়। না হোক, খরচের খাতায় লিখে রাখা বিষয়টিকে যে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে এই যথেষ্ট। অন্য কিছু নিয়ে মন খুঁত খুঁত করা এখন নিরর্থক।

কয়েকদিন থেকে কলকাতায় বৃষ্টি নেমেছে।

মাঝে মধ্যে জোরে এক পশলা হয়। নইলে অধিকাংশ সময় ঝিরঝির করে পড়ে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। সুজয় দিন দুয়েক ধরে হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসা ছাড়া আর কোথাও যাচ্ছে না। এই রকম জল হাওয়ায় লেখার আমেজ মনকে গাঢ় করে তোলে।

প্যাচ প্যাচে জল হাওয়ায় না বেরিয়ে অর্দ্ধ সমাপ্ত লেখাটায় সুজয় মন দিয়েছিল। লিখতে লিখতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। চটকা ভাঙ্গল দরজার শব্দে। দরজায় ছিটকিনি লাগান ছিল না—ভেজান ছিল শুধু। কে আবার এল। মুখ ফেরাতেই অবাক হয়ে গেল সুজয়।

একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা ঘরে প্রবেশ করেছেন।

তাঁদের চোখেও বিস্ময়।

নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে সুজয় বললে, আপনারা······

আগন্তুক পুরুষটির বয়স বেশী নয়। বছর ত্রিশেকের মধ্যেই হবে। মহিলাদের মধ্যে একজন বিবাহিতা। স্থূলাঙ্গী। বয়স বছর চব্বিশ হতে পারে। দ্বিতীয়জন অবিবাহিতা। কুড়ির কোঠা সবে বোধহয় ছুঁয়েছেন। তন্বী এবং সুশ্রী।

তাকে থামিয়ে পুরুষটি বললেন, ডাঃ বাসু কি বাড়ী আছেন ?

—থাকার তো কথা।

—আপনি কি তাঁর……

—না। আমি তাঁর কেউ হই না। ভাড়াটে।

—ক্ষমা করবেন, আমরা বুঝতে না পেরে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছি।

—তাতে কি হয়েছে। এই ঘর থেকে বেরুলেই ছোট একটা বারান্দা পাবেন। ওখানে আরো একটা দরজা আছে। কলিং পুসও আছে।

আরো এক প্রস্থ ক্ষমা প্রার্থনা জানিয়ে তিনি মহিলা দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুজয় কয়েক মিনিট দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। এরকম বৃষ্টি বাদল মাথায় করে কারুর বাড়ীতে বেড়াতে আসার কোন মানে হয়? আশ্চর্য—। আবার সে লেখায় মন দিল।

তিনদিন বিশ্রী জল হওয়ার পর আকাশ পরিষ্কার হল। কলকাতা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল যেন। এ'কদিনে সুজয়ের লেখার কাজ খুব ভাল ভাবে এগিয়েছে। আজ আর লিখবে না। মনকে একটু হাল্কা হবার সুযোগ দেওয়া দরকার। সকাল সাড়ে আটটার সময় ঘরে চাবি লাগিয়ে মন্থর পায়ে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াল। চৌরঙ্গীর কোন রেষ্টুরেণ্টে জলযোগ সারবে এই ইচ্ছে। তারপর গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিরে আসবে।

আজ একটু আগাম ট্রামে বাসে ভীড় আরম্ভ হয়ে গেছে। বৃষ্টির বেড়াজালে আটকে থাকা মানুষ মনে হয়, এ'কদিনের জমা

কাজ সেরে নেবার জন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে নিজেদের আস্তানা থেকে। অনেক চেষ্টা করেও সুজয় চৌরঙ্গীগামী কোন যানে জায়গা করে নিতে পারল না। ঝুলতে ঝুলতে অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু ওভাবে যাওয়া সে পছন্দ করে না।

ট্যাক্সি পাওয়া গেলে ভাল হত। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও খালি ট্যাক্সির সন্ধান পেল না। অগত্যা প্রতিদিনকার মত "সুরেখা কাফে"তে ব্রেকফাস্ট সেরে ফিরে চলল। তার গৃহকর্তা ডাঃ বসুর প্রচুর পসার। নিজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই খান বার ফ্ল্যাটের একটা বাড়ী তৈরী করাচ্ছেন। গ্রাউণ্ড ফ্লোর কমপ্লিট হয়ে গেছে। সুজয় স্থির করে রেখেছে আইনগত ঝামেলা মিটলেই ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে ওই ফ্ল্যাটের একটা ভাড়া নেবে।

গেটের কাছে পৌঁছে সেদিনকার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সুজয়ের দেখা হয়ে গেল। যিনি কয়েকদিন আগেকার এক বর্ষা মেদুর সন্ধ্যায় দুজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। হন্তদন্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে থামলেন।

—চিনতে পারছেন ?

—বিলক্ষ্যন।

—আমরা তো আপনার প্রতিবেশী হলাম। আসুন না একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে।

—নতুন একতলার ফ্ল্যাটে আপনারাই এসেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ। সেদিন বাড়ীওয়ালার খোঁজে এসে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। আলাপ পরিচয়টা তাহলে হয়ে যাক। আমি তিমির রায়। "পারকিন্সন ফাউণ্ড্রীর" ফোরম্যান।

—সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করি না।

তিমির রায় মৃদু হেসে বলল, কাজকর্ম করেন না কি রকম ? আপনি তো একজন লেখক।

এবার সুজয়ের হাসার পালা।

—বেকারদের পর্য্যায়ে লেখকদের সহজেই ফেলা যায়। আমার সম্পর্কে আপনাকে কে বলল ?

—মিসেস্ বাসু বলছিলেন। অল্প বয়সেই নাকি খুব নাম করেছেন। আমার মশাই আবার সাহিত্যে তেমন টেষ্ট নেই। তবে আমার বৌ আর শালী গল্পের বই এর পোকা। ওরা আপনার গল্প পড়েছে বললে।

—অবসর সময় বইটই পড়ুন, তাহলেই ধীরে ধীরে আপনারও টেষ্ট আসবে।

—তা যা বলেছেন। আপনার মত সাহিত্যিককে যখন কাছে পেয়েছি তখন মনে হয় চেষ্টা করলে আমিও একজন সমজদার পাঠক হয়ে উঠব। এখন চলি। কারখানার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

তিমির রায় সার্কুলার রোডের দিকে এগুলো।

সুজয় বুঝতে পারল না, লোকটা সত্যি কাঠখোট্টা না, তাকে বিদ্রুপ করে গেল। সে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাকাল ভারা-বাঁধা অর্দ্ধ নির্মিত বাড়ীটার দিকে। নীচের সদ্য সমাপ্ত ফ্ল্যাটটা আগেকার মতই নিস্তব্ধ। ওখানে লোক আছে বুঝতে পারা যায় না।

সুজয় নিজের ঘরে এসে কাগজ কলম নিয়ে বসল।

দিন সাতেক পার হয়ে গেছে।

তিমির রায়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি সুজয়ের। বলতে গেলে ওদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। মতিলালকে লেখা সদ্য সমাপ্ত চিঠিটা খামে বন্ধ করে ডাক বাক্সে ফেলে আসবে কিনা ভাবছে—দরজায় করাঘাত হল। এ মাসের ভাড়া এখনও দেওয়া হয়নি। ডাঃ বাসুর দারোয়ান চাইতে এসেছে বোধহয়।

দরজা খুলে কিন্তু দারোয়ানের পরিবর্তে তিমির রায়কে দেখল।

নির্বিকার মুখে সে ঘরে প্রবেশ করে বলল, আপনি আচ্ছা

লোকতো মশাই। একদিনও এলেন না আমাদের ওখানে!

মৃদু গলায় সুজয় বলল, নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

—ওদিকে বাড়ীর দুজন তো আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত। সাহিত্যিক হওয়ার ওই মজা। বিশেষ মেয়ে মহলে খুব খাতির পাওয়া যায়।

—কি জানি! আমি তো সেরকম কিছু দেখিনি।

—ক্রমে ক্রমে দেখবেন। এখন আপনার বয়সই বা কত? আর কথায় কাজ নেই। চলুন, আমাদের ওখানে।

—এখুনি— ?

—ক্ষতি কি? নিজে থেকে যখন যাবেন না তখন ধরে বেঁধেই নিয়ে যেতে হবে।

যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে সুজয়ের নেই, তবে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প দেখে সে তিমির রায়কে অনুসরণ করল। বসবার ঘরে আসবাবের বাহুল্যতা নেই। বেশ ছিমছাম। সুজয়কে বসতে অনুরোধ জানিয়ে তিমির রায় ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে স্ত্রী ও শালীকাকে সঙ্গে নিয়ে।

বিলিতি কায়দায় তিমির আলাপ করিয়ে দিল।

—ইনি হলেন আমার স্ত্রী দেবী রায়, আর ইনি আমার শালীকা ছবি মুখার্জী। এঁর পরিচয় তো ......

—থাক্ ওঁর পরিচয় আর তোমায় দিতে হবে না। আমরা জানি।

দেবী হাত তুলে নমস্কার জানাল। ছবিও।

সুজয় প্রতি নমস্কার করল।

তিমির স্ত্রীকে তাড়া দিল, কি গো, অতিথিকে কি খালি মুখেই রাখবে? চা-টার ব্যবস্থা কর গিয়ে।

—ব্যবস্থা সব করাই আছে। তুমি কেষ্টকে শুধু গিয়ে বলে এস।

সুজয় বলল, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি চা খাই না।

দেবী বিস্ময় প্রকাশ করল।

—সেকি! লেখকরা তো শুনেছি খুব চা খান।

—আমি খাই না।

—কোন অসুবিধা হয় না? ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা ছাড়া লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?

—এখনও পর্যন্ত তো কোন অসুবিধা বোধ করিনি। ক্লান্তি দূর করার জন্যে অবশ্য মাঝে মধ্যে হরলিক্স খেতে হয়।

—চা এ আপত্তি আছে বুঝলাম। টা নিশ্চয় কোন অপরাধ করেনি।

কথা শেষ করেই তিমির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে সুজয় হাসল।

—এ মাসের "জাগরণে" আপনার "উজান যাত্রা" পড়লাম। ভাল লাগল।

—সত্যি ভাল লেগেছে? এই প্রথমবার একজন রিডারের মুখ থেকে শুনলাম, আমার গল্প তাঁর ভাল লেগেছে। মনে হয়, পরিশ্রমের এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

—লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের যোগাযোগ তো কম তাই বোধ-হয় সব সময় আপনারা নিজেদের রচনা সম্পর্কে সাধারণের কি ধারণা বুঝতে পারেন না।

—তা অবশ্য। তবে অভিজ্ঞতাই হল মূল কথা। আমি আর কদিনের লেখক। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকরা সাধারণ পাঠকের ভাল লাগা না লাগাকে তেমন আমল দেন না। নিজেদের রচনার মূল্যায়ন নিজেরাই করেন।

দেবী এই কথার জের না টেনে বলল, আপনার লেখার সম্পর্কেই একটা প্রশ্ন করতে চাই। অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন—

—আপনি নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করুন।

—আমি "উজান যাত্রা"র শীলার কথা বলছি। তার মনের অলিগলির কথা লিখেছেন। মেয়েদের বিষয় এত জানলেন কি

ভাবে ? আপনি কি—

—আমি—?

—মানে · আমি বলছিলাম···মেয়েদের মনের কথা জানতে হলে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা তো দরকার।

—আমি কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগই পাইনি। বিচিত্র এক জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। তবে কি ভাবে এত কথা লিখি এ প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি এর উত্তর আমিও দিতে পারব না। কেমন যেন কলমের ডগায় এসে যায়।

ছবি কতক্ষণ চুপ করে ছিল।

এবার বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই ?

সুজয় দ্রুত গলায় বলল, না, না সে কথা আমি বলব কেন ? যে কোন মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় মূলধন আর কিছু নেই। আমি যদি কাশ্মিরের পাহাল গাঁও না দেখে থাকি তাহলে তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে বোধহয় এই ধরনের অভিজ্ঞতা থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমার মনে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই একজনের মনে আরো অনেকের সম্পর্কে ধারনার ছায়া ফেলে।

এই সময় তিমির ঘরে প্রবেশ করল।

ট্রেতে কিছু মিষ্টি ও নোন্তা বয়ে আনল একজন অল্প বয়স্ক ভৃত্য।

মুখে হাসি টেনে ছবি বলল, আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন ? একচোট খেয়ে এলেন নাকি ?

—তোমরা তো আমায় শুধু খেতেই দেখ। অন্য একটা কাজে ব্যস্ত দিলাম।

দেবী বলল, তুমি বাপু একটু খেতে ভালবাস। তার উপর মিষ্টি দেখলে তোমার জ্ঞান থাকে না।

বিমর্ষ ভাবে তিমির বলল, দেখছেন তো, বৌ আর শালী মিলে আমায় কি রকম খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছে। মিষ্টি কার না ভাল লাগে বলুন? তাছাড়া আমার কি ডায়বিটিস আছে যে মিষ্টি খাব না?

সহাস্যে সুজয় বলল, কারুর কথা কানে তুলবেন না। চুটিয়ে ময়রাদের শিল্প কার্যের সদ্ব্যবহার করে যান।

—যা বলেছেন। মেয়েদের কথায় কান দিলে সংসারে টিঁকে থাকা চলে না। নিন, এবার আপনি আরম্ভ করুন।

—এত আমি খেতে পারব না।

—পারবেন না বললে চলবে না। লেগে পড়ুন।

হাসি মুখে দেবী বলল, চাপাচাপি করছো কেন? তোমার মত সকলকেই মিষ্টিখোর হতে হবে? আপনি যা পারেন খান।

ছবি বলল, এখন কি লিখছেন?

—একটা বড় লেখা ধরেছি। গল্প বিস্তার আদিবাসীদের সুখ দুঃখ নিয়ে। অবশ্য এ আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ লেখা।

তিমির প্রশ্ন করল, কি রকম?

—আমি রাঁচিতে বড় হয়েছি। সুযোগ সুবিধা পেলেই এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শহর থেকে দূরের আদিবাসী পল্লীগুলিতে চলে যেতাম। তাদের জীবন যাত্রার অনেক খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছি। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখছি "ব্যাকুল বসন্ত"।

আরো কিছুক্ষণ গল্প গুজোব করার পর সুজয় বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর দেবী বলল, আর্থিক অবস্থা এঁর খুব ভাল। শুধু ভাগ্যের দোষে এরকম ভাড়া করা ঘরে পড়ে আছেন।

—তোমায় কে বলল? মিসেস বাসু—?

—হ্যাঁ। ছেলেটি সব দিক দিয়েই ভাল, তুমি কি বল?

ছবি মন্থর পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

তিমির বলল, ভাল বইকি। টাকা আছে, নাম আছে—একজন মানুষের জীবনে এতো মোর দ্যান অ্যানাফ।

—বলছিলাম কি, ছবির জন্যে ওঁকে রাজী করানো যায় না।

—তুমি কি বিয়ের কথা বলছো? আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবে মাত্র আলাপ হয়েছে, এখনই কখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যায়? তাছাড়া লেখক মশাই এর বয়সই বা কত?

—যতই কম হোক, ছবির চেয়ে যে বড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার দৌড় বোঝা গেল। সুযোগ বুঝে আমিই পাড়ব কথাটা।

তিমির বিরক্তির সুরে বলল, এখন ও সমস্ত বলতে যেওনা। কিছুদিন যাক, ঘনিষ্টতা বাড়ুক, তারপর দেখা যাবে।

দেবী একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবা প্রত্যেক চিঠিতে তাড়া দিচ্ছেন বলেই আমি একটু ব্যস্ত হয়েছি। একটা ব্যাপার হলে অবশ্য সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

—কোন ব্যাপার?

—সে তুমি বুঝবে না।

মুচকি হেসে দেবী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এই পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিয়ে রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিমির পাটনার ছেলে। ওর বাবা ওখানে ওকালতি করেন। চাকরী পাবার পর থেকে বছর সাতেক কলকাতাতেই আছে। ছুটি ছাটাতে বাড়ী যায়। বছর তিনেক হল জলপাইগুড়িতে বিয়ে করেছে। অবশ্য শ্বশুরবাড়ী থেকে ঠিক শহর নয়—শহর থেকে দূরে গ্রাম ঘেঁষা জায়গায়।

এই কারণেই ছবির পড়াশুনায় বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল। দেবী ও তিমির তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে। বছর খানেক ধরে এখানেই আছে। তবে হোষ্টেলে জায়গা পেলেই চলে যাবে, এই রকম স্থির হয়ে আছে।

দিন কুড়িক বাদে কলকাতার লোক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল আবার সারা শহর ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছে। অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছিল সুজয়, বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ বিগড়ে গেল। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি হলেই তো পারতো। আবার এখন কেন?

এই রকম জল হাওয়া সে পছন্দ করে—লেখায় বেশ মন বসানো যায়। তবে আজকের কথা সতন্ত্র। আজ কয়েকটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। এই রকম জল মাথায় করে এখানে ওখানে যাওয়া কি সহজ কথা? উপায় নেই, নিজের স্বার্থেই সমস্ত অসুবিধা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

রেনকোট গায়ে চাপিয়ে নিয়ে, সাড়ে নটার সময় সুজয় ঘর থেকে বেরুল। তাকাল একবার তিমিরের ফ্ল্যাটের দিকে। বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। দরজা জানলা সমস্ত বন্ধ। ওদের আগ্রহেই এ'কদিনে কয়েকবার সুজয় ওখানে গেছে। আড়ষ্ট ভাব এখন একেবারেই নেই। সাহিত্য বিষয়ক ছাড়াও অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে পেরেছে।

দিন কয়েক আগে তো ওকে একটা গল্প বলতে হল।

এক অজানা আকর্ষণেই তিমিরের ফ্ল্যাটে গত পরশুদিন গিয়েছিল সুজয়। তিমির কোথায় যেন বেরিয়েছিল। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ দেবী বলল, আমাদের একটা গল্প শোনান না।

—গল্প।

—হ্যাঁ। আপনার লেখা গল্প। আমাদের জানা হলে চলবে না কিন্তু।

মৃদু হেসে সুজয় বলল, আপনারা আমার কোন কোন গল্প পড়েছেন জানিনা তো। তাছাড়া অনেক সময় লেগে যাবে। ধৈর্য্য রাখতে পারবেন না।

দেবীও হাসল।

—আমাদের কত ধৈর্য্য পুরুষরা তা জানে না। অবশ্য আপনার মুখ ব্যথা হবে এও একটা কথা। ছোট একটা বলুন না হয়।

—আপনি তো কিছু বলছেন না?

—দিদি চমৎকার প্রস্তাব করেছে। কোন সাহিত্যিকের মুখ থেকে তাঁর লেখা শোনা তো ভাগ্যের কথা।

—তুই ঠিক বলেছিস ছবি।

একটু চিন্তা করে সুজয় বলল, লক্ষ্য করেছেন বোধহয় "মাতৃভূমি"তে এক মিনিটের গল্প শীর্ষক একটা ফিচার বেরুচ্ছে। আগামী কয়েক সংখ্যার মধ্যে ওই ব্যানারে আমারও একটা লেখা থাকবে। ওই গল্পটাই বলছি।

—বেশ তো।

—আমি কিন্তু ঠিক যেভাবে লিখেছি সেই ভাবেই বলব।

—সে তো আরো ভাল। সারাংশ শুনলে রস পাওয়া যায় না।

সুজয় গল্প আরম্ভ করল—

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তখন। অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার বিহারে শীত পড়েছে অনেক বেশী। এই রকম ঋতুতে আবার আমার কলকাতা যাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কিউল স্টেশনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম। ষ্টেশন কাঁপিয়ে নর্থ বিহার এক্সপ্রেস এল এগারটা বত্রিশ মিনিটে। প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোক না থাকায় কোন কোলাহল নেই, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চতুর্দিক যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠলাম। নাইট ল্যাম্প জ্বলছিল। আবছা আলোয় দেখলাম আমার সহযাত্রী তিনজন বার্থে লম্বমান—একজন বৃদ্ধ, একজন প্রৌঢ়া ও একটি তরুণী। মনে হয় একই পরিবার ভুক্ত তিনজনে। আমি তাড়াতাড়ি বাঙ্কে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর দুলুনীতে তন্দ্রা এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা, ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেন কোন স্টেশনে এসে থেমেছে। লক্ষ্য করলাম তরুণী

বার্থে উঠে বসেছে, শার্শির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এই সময় একজন কামরার মধ্যে উঠে এল। আগন্তুকের গায়ে ভারী ওভারকোট, বয়স বছর ত্রিশেকের মধ্যেই। তরুণী একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু গলায় বলল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলে না।

আগন্তুক হাঁপাচ্ছিল। কথা না বলে অন্যান্যদের দিকে ইসারা করল। তরুণী আগেকার মত চাপা গলায় বলল, দাদু দিদিমার ঘুম সহজে ভাঙ্গবে না। ও ভদ্রলোকও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আগন্তুক এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে।

বলল, তুমি কি করে ভাবতে পারলে আমি আসব না! বাস, রিক্সা কিছুই ওখানে পাওয়া যায় না। এমন কি একটা গরুর গাড়ীও সংগ্রহ করতে পারিনি। পাছে ট্রেন পাশ করে যায় এই ভয়ে দশ মাইল রাস্তা প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি।

তরুণী আগন্তুকের কাছ ঘেঁষে বলল, আমার বলাটাই অন্যায়। আমিতো জানি আমার চিঠি পাবার পর তুমি কখনই স্থির থাকতে পারবে না।

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করেছে। একটানা যান্ত্রব শব্দ ভেসে আসছে বাইরে থেকে। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে রইলাম। সামান্য নড়াচড়া করতেও সাহস হচ্ছে না—যদি ওরা বুঝে ফেলে আমি জেগে আছি।

– তোমার বাবার মত কড়া গার্জেনকে ম্যানেজ করে, দাদু-দিদিমার সঙ্গে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করা কম কথা নয়। তোমার বাহাদুরী আছে।

মনে হল মেয়েটি হাসল।

—অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে আসতে পেরেছি। পরের ষ্টেশন আসতে আর কতক্ষণ?

—বেশীক্ষণ আর নেই।

তরুণী বার্থের তলা থেকে মাঝারি সাইজের একটা সুটকেশ

টেনে বার করে বলল, বার করে রাখাই ভাল। নইলে নামবার সময় এটা নিয়ে যেতেই ভুলে যাব।

আগন্তুকের গলা দিয়ে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে, তুমি নামবে?

—হ্যাঁ। পরের ষ্টেশনে তোমার সঙ্গে আমিও নেমে পড়ছি।

—নেমে পড়বে!

—এত অবাক হচ্ছ কেন? আমি তো ওকথা চিঠিতে লিখে ছিলাম।

—লিখেছিলে ঠিকই। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কিসের?

—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না রমা, ভাবাবেগে কিছু করাটা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার।

—গভীরভাবে চিন্তা আমি করে দেখেছি। তুমি ভয় পেয়ে যাবে আমার কিন্তু আগে মনে হয়নি।

—তুমি আমায় ভুল বুঝছো। ভয় আমি পাইনি। আমি শুধু তোমার কথা ভাবছি। বৈভবের মধ্যে তুমি মানুষ—আমি কি তোমায় সুখী করতে পারব?

—এ তোমার বিচিত্র কথা। বলতে চাও, যারা স্কুলে মাষ্টারী করে তারা বিয়ে-থা করে না? শোন মশাই, ধনী বাপের মেয়ে হওয়াকে আমি মোটেই একটা কয়ালিফিকেশন বলে মনে করি না।

ট্রেনের গতি মন্দিভূত হয়ে আসছে। আগন্তুক কিছু বলল না। ও বোধহয় কিছু চিন্তা করছে। ওর জীবনে নিঃসন্দেহে এ এক বিশেষ পরীক্ষার সময়। সম্পূর্ণ চুপচাপই কেটে গেল কয়েক মিনিট।

তরুণী নীরবতা ভঙ্গ করল, কি ভাবছো?

—নিজের কথাই ভাবছি। এত বড় সৌভাগ্যের দিন আমার জীবনে আর আসেনি। তবু মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ খচ করছে। এতদিন শুধু তুমি আমাকেই দেখেছো, আমার দৈন্যতা

দেখনি। ঠিক আছে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তুমি আমাকে ভাল বাসবে।

ট্রেন থামল।

তরুণ সুটকেশ তুলে নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। রমা অনুসরণ করল ওকে। ওরা নেমে যাওয়ার পরও আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ইচ্ছে করলে রমার দাদু-দিদিমাকে তুলে দিয়ে বাধার সৃষ্টি করতে পারতাম।—ইচ্ছে হল না। দুটি মিলনৎসুক নর-নারী সুখে-দুঃখে ঘর সংসার করুক। অবশ্য বুড়ো বুড়ির উৎকণ্ঠা আর হা-হুতাশ দেখবার জন্য আমি অপেক্ষা করিনি। পরের ষ্টেশনেই কামরা বদল করলাম।

সুজয়ের গল্প শেষ হল।

—কেমন শুনলেন?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবী বলল, চমৎকার।

—আপনার কেমন লাগল?

সহাস্যে ছবি বলল, বেশ মিষ্টি গল্প।

এরপর সুজয় চলে এসেছে ওখান থেকে।

সময় বলতে গেলে একরকম ভাল কাটছে।

ছবির সঙ্গে দুদিন বাড়ীর গেটের কাছাকাছি দেখা হয়েছে। ফুটপাথ ধরে পাশাপাশি দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়েছে। সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কোন কথা নয়, এলোমেলো নানা কথা। তারপর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়েছে দুজনের। ছবি বেথুনের দিকে গেছে, আর সুজয় কলেজ ষ্ট্রীটের পথ ধরেছে।

ভাগ্য ক্রমে সুজয় রাস্তায় নেমেই ট্যাক্সি পেল।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টগুলো সেরে সে যখন নিশ্চিন্ত হল তখন দেড়টা বেজে গেছে। খাওয়া হয়নি এখনও। "আমিনিয়া"য় গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল সুজয়। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ধর্মতলার মোড়ে এসে ঘরে ফেরার ইচ্ছা বাতিল করে দিল। "কাহিনী জগৎ" এর

কার্য্যালয়ে একবার যাওয়া দরকার। একটা গল্পের সম্মান দক্ষিণা পাওনা রয়েছে। তাগাদা দিয়ে আদায় করতে না পারলে টাকা পাঠাবার কথা ওদের বিশেষ মনে থাকে না।

সুজয় ট্রাম টার্মিনাসের দিকে আর না গিয়ে বাস ষ্টপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ন নম্বর বাসে এক রকম ঝুলতে ঝুলতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ আর বিডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে পৌঁছাল। "মিনার্ভা" থিয়েটারের কাছেই "কাহিনী জগৎ" এর কার্য্যালয়।

দেখা হল না সম্পাদকের মশাইয়ের সঙ্গে। তিনি কি কাজে যেন দিল্লী গেছেন। বিফল মনে সুজয় আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে কতটুকুই বা পথ, হেঁটেই চলে যাবে নিজের আস্তানায়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অতিক্রম করে বিডন ষ্ট্রীটের অপর প্রান্তে গিয়ে ঢুকল। ফুটপাথ ধরে কয়েক পা এগুবার পরই সচকিত সুজয় থামল।

ছবি একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে।

ছবি !!!

সেও তাকে দেখতে পেয়েছিল।

তার কেমন নন্ত্রস্ত ভাব।

সুজয় মুখোমুখি পৌঁছে বলল, আপনি—?

—বান্ধবীর বাড়ী এসেছিলাম।

—আজ কলেজ বন্ধ নাকি ?

—না। বৃহস্পতিবারে দুটোর পর আমার আর ক্লাশ থাকে না। আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

—"কাহিনী জগৎ" এর অফিসে। আপনি এখন বাসায় ফিরবেন তো ?

—হ্যাঁ।

—চলুন। একই সঙ্গে যাওয়া যাক।

দুজনে নীরবেই ক্রমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট অতিক্রম করে হেদোর

মোড়ে গিয়ে পৌঁছাল।

সুজয় বলল, আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি কি ?

ছবি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন—

—"বসন্ত কেবিনে" বসে আমরা দু'কাপ কফি খেলে কেমন হয় ?

মৃদু হেসে ছবি বলল, মন্দ হয় না।

ওরা "বসন্ত কেবিনে" প্রবেশ করে মুখোমুখি বসল। সুজয় বয়কে ডেকে আদেশ দিল কফি আনার। দুজনের মধ্যে কিন্তু কোন কথাবার্তা হল না। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতার মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই রকমই হয় সচরাচর দেখা যায়।

কফি এসে পড়ল।

পেয়ালার একবার ঠোঁট ঠেকিয়ে নিয়ে ছবি বলল, একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন ?

—বিডন ষ্ট্রীটে আমাদের দেখা হয়েছিল দিদিকে বলবেন না। কলেজ থেকে আমি এখানে ওখানে যাই দিদি তা পছন্দ করে না।

বেশ, বলব না। আপনার ক্লাশ ফ্রেণ্ডরা আমার নাম জানে ?··· মানে····আমার গল্প পড়েছে কেউ ?

—দু-একজন পড়েছে। বেশীর ভাগের ঝোঁক সিনেমা পত্রিকা-গুলোর দিকে। আপনি সিনেমার পত্রিকায় গল্প দেন না কেন।

—আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না। ওই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকরা যদি আমার কাছ থেকে গল্প নিতে চান, নিশ্চয় দেব। আসল কথাটা কি জানেন, আমাদের লাইনে মুখ,দেখাদেখি, গ্রুপইজিম ইত্যাদি এত উগ্র যে বলে বোঝান যাবে না। ক্রমেই আমি হতাশ হয়ে পড়ছি।

—সাহিত্যে কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়।

—উচিত কথা আজকাল আর কে মনে রাখে বলুন ?

—আচ্ছা, আপনার "ব্যাকুল বসন্ত" শেষ হয়েছে ?

—গত রাত্রে শেষ হয়েছে। এবার ভাবছি আপনাকে নিয়ে একটা গল্প লিখব।

—আমাকে নিয়ে!

ছবি অবাক হয়ে যায়।

—ঠিক আপনাকে নিয়ে নয়, আপনাদের নিয়ে। সেই গল্পে আপনি, আপনার দিদি, জামাইবাবু, সকলেই থাকবেন।

—আর আপনি—? আপনি ও কি সেই গল্পের কোন চরিত্র?

—আমি? হয়তো।

—আর কিন্তু বসব না। পাঁচটা বেজে গেছে।

—চলুন, ওঠা যাক। প্রায়ই কিন্তু আমাদের এই ভাবে দেখা হতে থাকবে, আপনি কি বলেন?

ছবি মুখ নীচু করে হাসল।

দেখতে দেখতে আবার বৃহস্পতিবার এসে গেল।

ছবি দুটোর সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সুজয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অবাক হবার মত কথা। হঠাৎ এই ধরনের সাক্ষাত বার বার হওয়াও সম্ভব? সুজয় মৃদু মৃদু হাসছে।

—বান্ধবীর বাড়ী যাচ্ছেন?

—কি ভাবে বুঝলেন?

—বাসার পথ উল্টো দিকে, আর আপনার গতি বিডন ষ্ট্রীটের দিকে দেখেই বুঝলাম।

—হ্যাঁ। ওখানে যাচ্ছিলাম। আপনি এদিকে কোথায়—?

—আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেদিন বললেন না, বৃহস্পতিবারে দুটোর পর আর ক্লাশ থাকে না।

ছবি সবিস্ময়ে বলল, আমি কিন্তু—

—আমাদের মাঝে মাঝে একান্তে দেখা হবে একথা ভুলে গেলেন। সপ্তাহের এই দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখতে আর কোন

ঝামেলা থাকে না। তাছাড়া—

—তাছাড়া—?

—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।

—বলুন না?

—এই ভাবে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার মধ্যে কোন আরাম নেই। চলুন না, কোথাও গিয়ে বসি।

—কোথায়?

—কোন নিরিবিলি জায়গায়।

ছবির হাবে ভাবে কিছু অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেল। তার বোধহয় আপত্তি আছে, কিন্তু সুজয়ের পরিষ্কার কথাবার্তার দরুণ মনের ভাব প্রকাশ করতে বাধছে। সুজয় বোধহয় কিছু অনুমান করল।

বলল, প্রতি বৃহস্পতিবারেই বোধহয় বান্ধবীর বাড়ী যাচ্ছেন। নিতান্ত অসুবিধা যদি না হয়, তাহলে আজ না হয় নাই গেলেন।

—না, না অসুবিধা আর কি—

নিজের ইতঃস্তত ভাবকে ছবি মন থেকে সরিয়ে দিল।

—কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

—আমি লেক টাউনের কথা ভাবছি। এখান থেকে কিছুটা দূর হবে অবশ্য তবে জায়গাটা নিরিবিলি। আপনি তো ওধারে যাননি।

—ফিরতে দেরি হবে না তো?

—বেশীক্ষণ না থাকলেই হল। দাঁড়ান, আমি একটা ট্যাক্সি দেখি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সকাল বা বিকেলের মত শোচনীয় অবস্থা দুপুরে হয় না। এ সময় ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

শ্যামবাজারের মোড় অতিক্রম করার পর ছবি বলল, আপনি দিদির প্রস্তাবে রাজী হলেন না কেন?

কয়েকদিন আগে দেবী প্রস্তাব করেছিল, হোটেলে গিয়ে সুজয়ের

খাওয়া দাওয়া সারার কি দরকার। অদূর ভবিষ্যতে এতে স্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য। তার চেয়ে সে খাওয়া পর্বটা ওদের সঙ্গে সারতে পারে। মাসিক টাকার বন্দোবস্ত থাকলে সংকোচের-ও কোন কারণ থাকবে না।

সুজয় রাজী হয়নি।

—আপনার দিদি খুব ভাল প্রস্তাবই করেছিলেন। কিন্তু আমার মত ছন্নছাড়া লোকের ঝক্কি কত তাতো তিনি জানেন না। আমি অবশ্য চিরকাল হোটেলে খাব না। অন্য ব্যবস্থা আসন্ন।

—কি রকম ?

—আরেকটা ফ্ল্যাট কমপ্লিট হলেই উঠে যাচ্ছি। তখন চাকর রাখব। সে রান্নাবান্না করে দেবে। এই ভাবে কিছুদিন চলার পর অন্য ব্যবস্থা।

—আবার অন্য ব্যবস্থা ?

সুজয় হেসে ফেলল।

—চিরকাল কি আর আইবুড়ো থাকব। বিয়ে করার পর আমার সংসার অন্য রূপ নেবে না কি ? ছবি আর কিছু বলল না।

বাকী সময় ট্যাক্সিতে দুজনে নীরব রইল।

লেক টাউনের মুখেই নেমে পড়ল ওরা। এবারে এখনও বাড়ী তৈরী হয়নি। দমদম বা পাতিপুকুরের দিক থেকে যে বাড়ীর শ্রেণী এগিয়ে আসছে তা বাঁকের ওধারে অদৃশ্য। আপ-ডাউনের প্রশস্ত পথ দুটি যেন দিগ্বলয়ে মিলিয়ে গেছে। দু' পাশের নীচু জমির এখানে ওখানে আগাছা আর ডোবা। কোন কোন ডোবার ধারে বসে ছেলেরা মাছ ধরছে। এখানে এলে বোঝাই যায় না, যুগ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত কলকাতা কাছেই।

ওরা ঘাসে ছাওয়া ফুটপাথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

সুজয় বলল, বাস সমস্যার কিছুটা সুরাহা করবার জন্য সরকার এখানে টাউনশিপ গড়ে তুলছেন।

—আরো টাউনশিপ চাই। প্রতিদিনই তো কলকাতায় লোক

বেড়ে চলেছে।

—খরচতো কম নয়। কোন দিক সামলাবে বলুন? ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বাংলার সমস্যাই সবচেয়ে বেশী।

নীরবে আরো কিছুদূর এগুবার পর ছবি বলল, আপনি আমায় কি যেন বলবেন বলছিলেন?

—জানি না আমার কথাগুলো আপনার কতদূর ভাল লাগবে। কয়েকদিন অনেক ভেবে যে ডিশিসনে পৌঁছেছি তা এখন আপনাকে না বলেও উপায় নেই। আসুন এখানে বসা যাক।

দুজনে ঘাসের উপর বসল।

রাস্তায় একেবারেই লোক চলাচল নেই। মাঝে মাঝে শুধু গাড়ী যাচ্ছে।

ছবি কিছু বলল না।

সুজয় আবার বলল, আপনি আমার সম্পর্কে কতদূর কি শুনেছেন বলতে পারব না। তবে নিজের সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি অর্থের অভাব আমার নেই। শুধু আজীবন আমি উপেক্ষিত। স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে নিদারুণ ভাবে বঞ্চিত। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু নিজের জীবনকে ঘোলা জল থেকে তুলে আনার জন্য বারংবার অবলম্বন খুঁজেছি। পাইনি।

—মিসেস বোসের মুখে আপনার সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনেছি। বাপ মা বেঁচে না থাকলে প্রথম জীবনে নানারকম বিড়ম্বনা আসবেই।

—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমি যেন কূল পেলাম। বিশেষে আপনাকে বাদ রেখে আমি এখন নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই পাচ্ছি না।

বিস্ময়ের অতলান্ত সমুদ্রে ছবি তলিয়ে যায়।

—আমি—!!!

—আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। যদিও আমার কথায় অত্যন্ত অধৈর্য্য ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আপনার মনের ভাব আঁচ না করেই

নিজের মনের কথা শোনানো শিষ্টাচার সম্মত নয় জানি। কিন্তু কি করব, আপনি আমার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে ছত্রখান করে দিয়েছেন। লেখায় আজকাল মন, বসাতে পারি না।

নত মস্তকে ছবি নিরুত্তর রইল।

—আপনি বেশ অবাক হচ্ছেন বুঝতে পাচ্ছি। মাত্র কয়েক দিনের সাক্ষাতে আমার সম্পর্কে হয়তো কোন ধারণাই গড়ে তুলতে পারেন নি। আমায় এই অধৈর্যপনায় বিরক্ত হলেও দোষ দেওয়া যায় না। তবু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মতামত।

ছবি নিরুত্তর।

—কিছু বলুন—

—আমি কি বলব ?

—এখন বলার পালাতো আপনারই।

—আপনি···আপনি কি···

সাগ্রহে সুজয় বলল, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই ছবি।

ছবি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

সুজয় উত্তরের অপেক্ষায় নীরব থাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ছবি বলল, আমাদের মতামতই তো শেষ কথা নয়। মাথার উপর তো অনেকেই রয়েছেন।

—আমার মাথার উপর কেউ নেই তাতো জান। আমার গার্জেন আমি নিজেই। আর আমি মনে করি তোমার মতামতই হল এই ব্যাপারের শেষ কথা।

—কিন্তু দিদি—

—তোমার দিদি যে আমাকে ভাল চোখে দেখেন তা আমি জানি। তাঁর অমত হবে না। তিমিরবাবুও নয়। তাঁরাই তোমার বাবাকে রাজী করাবেন। আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি ভাবতেও পারিনি এত সহজে তোমার সম্মতি পাওয়া যাবে।

—আমিও ভাবতে পারিনি····

—আমি হঠাৎ এই রকম একটা প্রস্তাব করে বসব। সাহিত্যিক-দের ধৈর্যশীল হওয়াই উচিত। লেখার ব্যাপারে আমার ধৈর্য্যের ছাপ থাকে কি না, তার বিচার পাঠকরা করবেন। ব্যবহারিক জীবনে যে নিদারুণ ধৈর্য্যের অভাব তাতো দেখতেই পেলে। জানিনা আগামী জীবনে এই ধৈর্য্যের অভাবে আমাকে পদে পদে ঠকাবে কি না।

—আপনি কি আজই দিদিকে কথাটা বলবেন?

—ব্যস্ততার কিছু নেই। ধীরে সুস্থে বললেই চলবে। বিয়ের আগে আমি নিজের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিতে চাই। ইতিমধ্যে তুমিও পাশ করে যাবে।

ছবি কিছু না বলে ঘাসের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল।

—তুমি কিন্তু সহজ ভাবে কথা বলছো না?

বলছি তো!

....উঁহু। লজ্জা করছে?

—না। এবার কিন্তু আমাদের ফেরা উচিত। আকাশের অবস্থা দেখছেন? যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি এসে যেতে পারে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সুজয় বলল, তাইতো। অনর্থক ভিজে লাভ নেই। উঠে পড়াই ভাল। আবার ট্যাক্সি ধরার ঝামেলা আছে।

দুজনে, উঠে দাঁড়াল।

সুজয় প্রশান্ত মনেই আবার লেখায় মন দিয়েছে। তার জীবনে এই প্রথমবার এত বড় জয়লাভ। সে কল্পনাও করতে পারেনি ছবি এত সহজে রাজী হয়ে যাবে। তার জীবনের সুদিনের পদক্ষেপ এই ভাবে আরম্ভ হল।

বিয়ে সংক্রান্ত কোন কথাই এখনও জানায়নি দেবী বা তিমির কে। এমনকি কয়েকদিন ওদের ওখানে যায়নি পর্য্যন্ত। সুযোগ বুঝে বললেই হবে। তার আগে ডাঃ বাসুর সঙ্গে ফ্ল্যাট সম্বন্ধে

কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার। ভাল ঘর না পেলে ঘরনীকে পাশে রেখে সুখ নেই।

"ব্যাকুল বসন্ত" কে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না। নভেলেট। সুজয় রিভাইজ করছিল। গতকাল "নানা রং" এর সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ বিকেলে গল্পটা ওখানে দিয়ে আসবে। ঠিক এই সময় তিমির এসে উপস্থিত হল। তাকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

—আসুন—আসুন—

—আপনার কাছে আসতে হল বিশেষ একটা ব্যাপারে।

—কি বলুন তো ?

তিমির বসতে বসতে বলল, ছবির বিয়ের কথা বলছিলাম। আপনি কি এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ?

সুজয় সচকিত হল। এ ধরণের প্রশ্ন সে আশা করেনি। ছবি তাহলে কথাটা বাড়ীতে বলেছে! এক দিক থেকে ভালই হল। সংকোচকে সামনে রেখে সমস্ত কথা গুছিয়ে বলতে বেশ অসুবিধা হত। কিন্তু কি ভাবে সে এই প্রসঙ্গটা তুলেছিল এঁদের কাছে।

—কথাটা আমি আপনাদের বলতাম। আগেই জানতে পেরেছেন, ভালই হল। আপনার স্ত্রীও নিশ্চয় জানেন ?

—আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি কিন্তু দেননি।

—মন স্থির না করলে ব্যাপার এতদূর গড়াবে কেন ? এখন আমার একমাত্র কাম্য আপনাদের অনুমতি।

তিমির সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গীতে কয়েকটান দিয়ে বলল, আমাদের অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার কথা আসছে অনেক পরে। তার আগে আরো একটা প্রশ্ন করছি, আপনি ছবির ভার নেওয়ার উপযুক্ততা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন কি ভাবে ?

এই কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল সুজয়। পর মুহূর্তে অপমানে তার কান লাল হয়ে উঠল। ঘরে বয়ে এসে প্রকৃতপক্ষে এই লোকটা কি বলতে চায় ?

—আপনি কি বলতে চাইছেন ?

—আপনি বুঝতে পারেন নি ?

—না।

—নিজের সম্পর্কে আপনার উঁচু ধারণা থাকতে পারে, আমাদের কাছে কিন্তু তার কোন মূল্য নেই। আমার একজন উচ্চ পদস্থ বন্ধু আছেন, ছবির বিয়ের কথাবার্তা তার সঙ্গেই হচ্ছে।

—আপনার আর কিছু বলার নেই বোধহয় ?

—আপনি আর ছবির সঙ্গে দেখা করবেন না।

—আপনি কি মনে করেন, আপনার ডায়রেকশনে আমায় জীবন কাটাতে হবে ? আমি কি করব না করব তা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। ভবিষ্যতে আমার উপর আর খবরদারি করবেন না। এখন যেতে পারেন।

তিমির দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর সুজয় নুয়ে পড়ল চিন্তার ভারে। কল্পনায় যে সুদৃশ্য বাগান রচনা করেছিল প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় তা যেন এখন বিধ্বস্ত। কিন্তু এমন হল কেন ? বন্ধুর সঙ্গে ছবির বিয়েতে বাধার আঁচ পেয়েই কি ভদ্রলোক এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন ? কারণ যাই হোক তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অবশ্য এখন আর লাভ নেই। ছবির মনের দৃঢ়তার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে। সে ভয় পিছিয়ে গেলে আর কিছু করার নেই।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

দুটোর পর কলেজ থেকে ছবি বেরুলেই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে এই ছিল বাসনা। নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছিবার পর কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল সুজয়ের। কলেজের গেট দিয়ে মেয়েদের যাতায়াত নেই। বাস ষ্টপের সামনেও বই খাতা হাতে অপেক্ষারতা কাউকে দেখা যাচ্ছে না !

শেষে সুজয় কলেজ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দরওয়ান শ্রেণীর একজন লোকের কাছ থেকে জেনে নিল, ব্যাপারখানা কি।

কে একজন মারা গেছেন তাই ঘণ্টা খানেক আগে কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা সুজয় বিডন ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটায় দিকে পা বাড়াল। বান্ধবীর ওখানে যদি গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় কিছুক্ষণ পরে ওখান থেকে বেরুবে। তখন কোন রেষ্টুরেণ্টে বসে সহজেই কথাবার্তা বলে নেওয়া যেতে পারে।

একটু হেঁটেই সেই বাড়ীটার কাছে সুজয় এসে পেঁছাল। ফ্ল্যাট বাড়ী যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নোংরা বারোয়ারী সিঁড়ি দিয়ে অনেকেই ওঠা নামা করছে। সামনের ফুটপথে একটা পত্রিকার ষ্টল চোখে পড়ল। রাস্তা পেরিয়ে সুজয় ওখানে গিয়ে পেঁছাল। সময় কাটাবার জন্য অবলম্বন চাই। পত্রিকার পাতা উল্টে এখন সময় কাটান ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মিনিট কুড়িক অতিক্রান্ত হবার পর সুজয় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এর দিক থেকে তিমির আসছে। তার চলনে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। ফ্ল্যাট বাড়ীর গায়েই একটা পান সিগারেটের দোকান। ওখানে থেমে তিমির সিগারেট কিনল। দোকানদারের হাবভাব দেখে মনে হয় ক্রেতা তার পরিচিত। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে ঢুকে গেল বাড়ীর মধ্যে।

ব্যাপার কি? তিমিরের এই সময় এখানে উপস্থিতি বেশ বেখাপ্পা ব্যাপার। সুজয় ঘোরাল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। সে আবার রাস্তা অতিক্রম করল। এপারে এসে দাঁড়াল সিগারেটের দোকানের সামনে। দোকানদার উড়িষ্যা দেশীয় বলেই মনে হয়। এর কাছ থেকে কি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে?

—দুটো উইল্‌স্‌ দেখি—

দোকানদার প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে দিল।

পয়সা দিতে দিতে সুজয় বলল, তিমিরবাবু উপরে গেলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি রোজই এখানে আসেন নাকি?

—শুধু বৃহস্পতিবারে এই সময়ে আসেন।

—কার ফ্ল্যাটে উনি যান বলতে পার ?

এবার সন্দিগ্ধ চোখে সিগারেটওয়ালা সুজয়ের দিকে তাকে। এই কৌতূহল যে অহেতুক নয় এবার যেন বুঝতে পেরেছে। সুজয় যে তার মনের ভাব বুঝতে পারেনি তা নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে রহস্য উপন্যাসের নায়কের মতই পাঁচ টাকার একটা নোট তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে।

—খবরটা জরুরী।

বলা বাহুল্য সিগারেটওয়ালা নিজেকে সামলে নিয়েছে। অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সে নোটটা এবার নির্লিপ্ত ভাবে নিজের পকেটে রাখল।

—আজ্ঞে, দোতলার রজনী সেনের ফ্ল্যাটে আসেন।

সুজয় আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে চলল। পরিস্থিতি তাকে কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলেছে। সিঁড়ি শেষ হয়েছে টানা বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায়। পর পর ফ্ল্যাট। বারান্দায় কিন্তু লোকজনকে অবশ্য সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে।

রজনী সেনের ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া সহজ সাধ্য নয় জেনেই, তেতলার দিকে উঠে গিয়ে ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়াল সুজয়। নীচে কেউ নামনেই এখান থেকে দেখা যাবে। তাছাড়া দোতলার অনেকখানি অংশও দেখতে পাওয়ার সুবিধা রয়েছে। অথচ একটু পিছন দিকে সরে গেলে নীচে থেকে তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

দ্বিতীয় সিগারেটটাও এক সময় শেষ হল। সময় যেন বড় ঢিমে তালে এগুচ্ছে। ধৈর্য্য রাখা ক্রমেই সুজয়ের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠছে। এক ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করে রয়েছে। যতই অসুবিধা হোক সে অপেক্ষা করবে। প্রকৃত ব্যাপারটা কি তা নিশ্চত ভাবে তার জানা দরকার।

আরো কিছুক্ষণ পরে তিমির বেরিয়ে এল একটা ফ্ল্যাট থেকে। স্বচ্ছন্দ গতিতে শিস দিতে দিতে নেমে গেল নীচে। সুজয় কিন্তু ভেবে পেল না এখন সে কি করবে। নেমে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করবে

নাকি ? সে এক বিশ্রী ব্যাপার। অথচ আগেই তার স্থির করে নেওয়া উচিত ছিল এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কি তাকে করতে হবে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করল। সেই ফ্ল্যাট থেকে ছবি বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা রাখল ভ্যানিটি ব্যাগে। সুজয়ের মনের মধ্যে এক কুটিল চিন্তা উত্তাল হয়ে উঠল। তবে কি -? সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। কল্পনার অতীত এমন এক পঙ্কিল ঘটনার মূল সূত্র এখন তার হাতে। নিজের ভালবাসার সমাধি এই ভাবে চোখে দেখে মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। দুনিয়ার লোক চেনা সহজ নয়, এতদিন গল্প উপন্যাসে পড়েছে বা নিজে লিখেছে—আজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল।

সুজয় দ্রুত নেমে এসে ছবির মুখোমুখি হল।

ভূত দেখার মত ছবি চমকে উঠল।

—খুব ভয় পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে ?

—না…মানে…আপনি এখানে ?

—ভরা দুপুরের অভিসার কি রকম হয় তাই দেখতে এসেছিলাম। বন্ধ দরজার আড়ালে যা ঘটে তা অবশ্য চোখে দেখা যায় না। তবে—

—কি সমস্ত যা তা বলছেন !

—এখনও তুমি মনে কর, শালী-ভগ্নীপতির কেলি কাহিনী আমার অজানা রয়েছে ? তোমার ভয় করছে না, একবারও মনে হচ্ছেনা এই সমস্ত কথা আমি তোমার দিদিকে গিয়ে বলতে পারি ?

—আপনি…ছবির শরীর থরথর করে কাঁপছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে।—আপনি…

সে কথা শেষ করতে পারে না।

—আমি কি করতে পারতাম জান ? আজ আড়ালেই থেকে যেতাম। আগামী বৃহস্পতিবারে ওই ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা মারতেন তোমার দিদি। হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতে তোমরা।

তা আমি করিনি ছবি। তবে—

ছবি কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। সুজয়কে পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সুজয়ও ধীর পায়ে নীচে নেমে গেল। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই গিয়ে পেঁছাল নিজের ঘরে। ঠিক আত্মধিক্কার নয়, যেমন অনুকম্পা হচ্ছে এখন নিজের উপরই। ভাল কিছু সে যেন আশা করতে পারে না। বিচিত্র এক জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে!

এখন জলের মতই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার। রজনী সেন নিশ্চয় তিমিরের ঘনিষ্ট বন্ধু। তার ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি ছবির কাছেই থাকে। রজনী সেন দুপুরে কাজ কর্মে যায়, আর প্রতি বৃহস্পতিবারে তার খালি ফ্ল্যাটে জৈবিক ক্ষুধায় পিড়িত দুটি নর নারী মিলিত হতে থাকে। ছবির অবৈধ জীবন কবে আরম্ভ হয়েছিল, কি ভাবে তিমির তাকে এই পথে টেনে এনেছিল, সে সমস্ত প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। শরীর ঢেলে দিল বিছানায়। অজস্র চিন্তা তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে চলল। আজ প্রথমবার কলকাতাকে বড় বিস্বাদ লাগছে। মনে হচ্ছে, এখানকার সমস্ত প্রয়োজন বুঝি ফুরিয়ে গেল। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে এক সময় সুজয়ের চোখে ঘুম নেমে এল।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

হাতে ঘড়ি বাঁধাই ছিল। চোখ বুলিয়ে নিল, সাতটা দশ। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। তবু মন ঝরঝরে হয়নি। হবায় কথাও নয়। বিছানা থেকে নেমে সুজয় হাই তুলল। এখন সে কি করবে চিন্তা করতে লাগল। এই ঘর, এই আওতা তার একেবায়েই ভাল লাগছে না। অন্ততঃ আজকের রাতটা রেবতীবাবুর ওখানে কাটিয়ে আসবে কি?

দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

এখন আবার কে এল ?

দরজা খোলার পর বিস্ময়ের সীমা থাকে না সুজয়ের। ছবি ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। সে তখন হাঁপাচ্ছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে, বসে পড়ল চেয়ারে।

—কি মনে করে ?

—আপনার কাছে আমার না এসে উপায় ছিল না। তিমিরদা দিদিকে নিয়ে সিনেমায় গেছেন। এই সুযোগে চলে এলাম।

—কেন ? আমি আমার বোকামির পুরস্কার তো পেয়েছি।

—আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। দেখুন—

—আমি কিছু বুঝতে চাইও না। শুধু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না, এই নোংরা জীবনই যখন তোমার পছন্দ তখন আমার বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলে কেন ?

একটু চুপ করে থেকে ছবি বলল, আপনার মনকে ভেঙ্গে দিতে আমার মায়া হচ্ছিল। আমি জানতাম, একদিন আপনি সবই জানতে পারবেন। তবে এ জীবন আমার পছন্দ নয়। তবুও জানি, এর থেকে উদ্ধার পাবার আশাও নেই।

সুজয় তার কাছাকাছি এসে ব্যগ্র গলায় বলল, নিশ্চয় আছে। সমস্ত ভুলে যাব আমি। নতুন জীবন দিয়ে তোমাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসব। বল, রাজী আছো ?

—তা হয় না। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না—তা হয় না বরং—

—বরং—?

ছবি দরজার দিকে ফিরে চলল।

—তুমি কি বলতে এসেছিলে আমি জানি না। তবে যাবার আগে আবার জেনে যাও, আমার দিক থেকে কোন আশঙ্কার কারণ নেই। তোমার অবৈধ জীবন দীর্ঘতর হোক প্রার্থনা করি। তবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, দিদির জন্য তোমার মায়া হয় না ? ওই মহিলাটির অপরাধ কি ?

ছবি কোন কথা বলল না। শুধু একবার তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুজয় আবার বসে পড়ল বিছানায়। ঘটনা প্রবাহ তাকে ক্রমেই বিভ্রান্ত করে তুলছে।

এর পরের ঘটনার মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই।

পরের দিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠেছে সুজয়। অনেক হল, আর নয়। এবার সে গভীরভাবে লেখায় মন দেবে। হোটেলে অবশ্য ছিল এক হপ্তা। তারপর কলকাতার মায়া কাটিয়ে চলে গেছে হাজারীবাগে। নিজের বাড়ীতে থাকার উপায় নেই, কাজেই ছোট একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে।

ক্রমে তার আর্থিক সমস্যাসংকুল দিনগুলি মিলিয়ে গেল। রেবতীবাবু সমস্ত ব্যবস্থা করলেন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। মকদ্দমা করলে অবশ্য ট্যানারির ব্যবসা ফেরৎ পাওয়া যেত। কিন্তু পিসতুতো দাদাকে বেকায়দায় ফেলতে চাইল না সুজয়। ব্যবসা গেছে যাক। ও ফিরে পেয়ে আর লাভ কি? সে তো আর ওই ব্যবসা চালাতে পারবে না।

ভাড়াটে অবশ্য অনুরোধ গ্রাহ্য করেনি। তাকে তোলার জন্য মকদ্দমা করতেই হল। তারপর বছর দুয়েক কেটে গেছে নিজের বাড়ীতেই। মতিলালের সঙ্গে এখন যোগাযোগ অনেক বেশী। সে এখন বারবিঘাতেই আছে। ওখানকার ব্লক ডেভালাপমেণ্ঠ অফিসে চাকরী করে। ছুটিছাটায় আসে হাজারীবাগে বন্ধুর কাছে। মতিলালের গর্বের সীমা নেই। তারই অনুরোধে লিখতে আরম্ভ করেছিল বলে, সুজয়ের এত নাম হয়েছে।

সেবার পুজার ছুটিতে হাজারীবাগে এসে মতিলাল অনুরোধ করল।

অভিমান মিশ্রিত গলায় বলল, এই একতরফা ব্যাপার আমার আর মোটেই ভাল লাগছে না। আমি বার বার এখানে আসছি, অথচ তুমি একবারও আমাদের ওখানে গেলে না।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলল, অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি ভাই। তবে ইচ্ছে করে যে একাজ করি তা তো নয়। আমি একটু অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ তা তো তুমি জান মতি। আসল কথা খেয়াল করিনি। এবার যাব।

—আর তুমি গেছো।

—কবে যেতে হবে বল ?

—সত্যি যাবে ? তাহলে নভেম্বার মাসের শেষে এস। সে সময় ওখানকার জলহাওয়া ভাল।

—আমি কিন্তু একলা যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে রাইফেলটাও যাবে। ওখানে শিকার পাওয়া যায় কেমন ?

ইদানিং শিকারের দিকে ঝোঁক এসেছে সঞ্জয়ের। লেখায় মন বসাতে না পারলেই বেরিয়ে পড়ে রাইফেল কাঁধে করে শিকারের উদ্দেশ্যে। হরিণ আর হায়না মেরেছে বেশ কয়েকটা। ভাল্লুক মারার প্রবল ইচ্ছে তার। কিন্তু তেমন সুবিধা হয়ে উঠছে না।

—শিকার ভালই পাবে। বারবিঘার অল্প দূর দিয়ে বিন্ধাচল রেঞ্জের একটা শাখা চলে গেছে। পাহাড়ের নীচু অংশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল।

—ওখানে ভাল্লুক পাওয়া যাবে ?

মৃদু হেসে মতিলাল বলল, পাওয়া যায় না এমন জন্তু নেই।

—বল কি ! আমি দারুণ উৎসাহ বোধ করছি মতি। তাহলে ওই কথাই রইল, নভেম্বরের শেষের দিকে তোমাদের ওখানে আসছি। তারপর চুটিয়ে হাতের সুখ করে নেওয়া যাবে।

সঞ্জয় নিজের কথামত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বারবিঘায় পৌঁছাল। মহাসমাদরে তাকে গ্রহণ করল মতিলাল। ওদের বাড়ীর সকলেও বিশেষ খুসী হলেন। সঞ্জয়কে মুগ্ধ করল ওখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী ও নিস্তব্ধ পরিবেশ। দ্রুত হাতে

গোটা তিনেক কবিতা লিখে ফেলল, যা সে আগে কখনও লেখেনি।

বারবিঘায় পৌঁছাবার দ্বিতীয় দিন শিকারের আয়োজন হল। দলে লোক বাড়াল না মতিলাল। সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে, বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। গোটা কয়েক হরিয়াল আর কাররা মেরে শিকারের সূচনা হল। মাঝারি গোছের একটা হরিণের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাকে লক্ষ্যের মধ্যে আনা গেল না। চতুর জীব।

দেখতে দেখতে কেটে গেল সাতটা দিন।

আজ এখান থেকে বিদায় নেবে সুজয়। মতিলাল বারংবার অনুরোধ করেও তারা যাত্রা ভঙ্গ করতে পারছে না। আজ হাজারীবাগ রওনা না হলে নাকি কোন এক একটা কাজের বিশেষ ক্ষতি হয়ে যাবে। অগত্যা—। ইতিমধ্যে অবশ্য দুজনে খুব বেড়িয়েছে, কয়েকবার শিকারে গেছে। অনেক সন্ধান করে ভাল্লুকের দেখা না পেলেও, প্রায় প্রাণ হাতে করে একটা চিতা মেরেছে।

বারবিঘার বুকের উপর দিয়ে রেললাইন যায়নি। ট্রেন ধরতে গেলে শেখপুরা যেতে হয়। এখান থেকে শেখপুরার দূরত্ব বেশ কয়েক মাইল। এই পথটুকু বাসে বা ট্যাক্সিতে অতিক্রম করার ব্যবস্থা আছে। বিশেষে ট্যাক্সি পাওয়া যায় যায় চব্বিশ ঘণ্টাই।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে সুজয় বলল, একটা কাজ করতে হবে মতি।

—বল—?

—এখানে আমার জন্যে কাঠা দশেক জমির ব্যবস্থা কর। বাস্তুজমি আর কি। যা দাম লাগে দেওয়া যাবে।

—জমি! মতিলাল সবিস্ময়ে বলে, জমি কি করবে?

—বাস্তু জমি লোকে কি করে? বাড়ী করব। খুব ভাল লাগছে জায়গাটা। নিরিবিলিতে লেখায় ভাল ভাবে মন বসান যাবে। দেখেছো তো, হাজারীবাগে কি রকম হট্টগোলের মধ্যে আছি।

—তুমি তো অবাক করলে হে! জায়গাটা পছন্দ হয়েছে বলে একেবারে তৈরী করে ফেলতে চাও? টাকা থাকলেই অনর্থক খরচ করতে হবে এর কি মানে আছে? ও সমস্ত খেয়াল ছাড়। তোমার যখন ইচ্ছে হবে, যতদিন ইচ্ছে হবে আমাদের বাড়ীতে এসে থাকবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

—আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পরই মনস্থির করেছি। হাজারীবাগে আমি কোন আকর্ষণই অনুভব করি না। ওখানকার চেয়ে এখানে অনেক ভাল ভাবে থাকতে পারব। সিরিয়াসলি বলছি ভাই। মাস খানেকের মধ্যেই জমি দেখে আমায় খবর দাও। তবে বসতি যেখানে ঘন সেখানে নয় কিন্তু। যতদূর সম্ভব নিরিবিলিতে—আমি লোকালয় থেকে একটু দূরেই থাকতে চাই।

এরপর আর কথা চলে না। সুজয় হাজারীবাগ রওয়ানা হবার পরই জমি সংগ্রহর ব্যাপারে মতিলালকে তৎপর হতে হল। বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। লোকালয়ের একটু দূরে জংলা পরিবেশে জমি পাওয়া গেল সহজেই। একেবারে নাম মাত্র দামেই পাওয়া গেল। স্থানীয় কনট্রাকটার পৃথ্বীপাল সিংকে ভার দেওয়া হল বাড়ী তৈরী করার। অবশ্য প্ল্যান কলকাতা থেকে তৈরী হয়ে এসেছিল।

কাজ শেষ হয়ে যাবার পর হাজারীবাগে বাড়ী ভাড়া দিয়ে লটবহর নিয়ে সুজয় বারবিঘায় চলে এল। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ পাঁচটা বছর। প্রশান্ত মনেই সে এখানে আছে। স্থানীয় মানুষরা তাকে বেশ খাতির করে চলে।

তবে এই কবছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে বারবিঘায়। সেই নির্জ্জনতা আর নেই। দিল্লীর এক কম্পানী এখানে কাঁচের ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছেন। জঙ্গল কেটে জমি বার করে অজস্র জমি কোয়ার্টার তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে পাওয়ার হাউস। কারখানার বিভিন্ন ভবন। কর্মসূত্রে অনেক বাঙালীও এখানে এসেছেন। অধিকাংশই উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুজয়ের। ঘনিষ্টতা হয়েছে শুধু রথীন মিত্রর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে আসেন বেড়াতে। সেও যায়। অধিকাংশ দিন সাহিত্য নিয়েই আলোচনা হয়। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে যে ঝড় চলেছে তার ছোঁয়াচ এখানে এসেও লাগে।

বলতে গেলে মতিলালের অভাব সস্ত্রীক রথীন মিত্র কিছুটা পূরণ করেছেন। বছর খানেক হল মতিলাল দুমকায় বদলী হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেছিল বেচারী বদলী রদ করবার। কিন্তু হুকুম টলল না।

একদিন হাসতে হাসতে মিসেস মিত্র বলেছিলেন, আচ্ছা, এই ভাবে আপনার একলা থাকতে ভাল লাগে ?

সুজয় হাসি মুখে বলেছিল, কেন লাগবে না বলুন ?

—এ হল গায়ের জোরের কথা। আপনার অভাবটা কিসের ? বিয়ে করে ফেলছেন না কেন বলুন তো ?

—বিয়ে ! বলছেন কি ? ওকাজ কি ভদ্রলোকে করে ?

উচ্চ হাস্যে ঘর প্রায় চৌচির করে ফেলেছিলেন রথীন মিত্র।

—আপনি তাহলে বলতে চান আমি ভদ্রলোক নই ?

সুজয় জিব দিয়ে শব্দ করে বলেছিল, আমি আমার মত ভদ্রলোকদের কথা বলছিলাম। আসল কথা কি জানেন, মেয়েদের ব্যাপারে আমার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আপনাদের বুঝিয়ে ঠিক বলতে পারব না। মোট কথা হল, ও সমস্ত বিড়ম্বনার মধ্যে আমি যাচ্ছি না।

…দেওয়াল ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল। চটকা ভাঙ্গল সুজয়ের। প্রায় এক ঘণ্টা বসে বসে ভেবেছে। মাঝে মাঝে এই ভাবে পুরানো কথা কেন যে মনে পড়ে যায়, সে নিজেই জানে না। কিন্তু আর নয়, আর বসে থেকে সময় নষ্ট করবে না। কাল ভোরে আবার ওঠার তাগিদ আছে।

গত বিকালে রথীনবাবু প্রস্তাব করলেন বেনারস যাবার।

অফিসের কাজে বাই রোড যাচ্ছেন। এতটা পথ একা একা যাওয়া রীতিমত বিরক্তকর, সুজয় সঙ্গী হলে তিনি খুশী হবেন। ওখানে থাকার মেয়াদ অবশ্য দিন দুয়েকের বেশী নয়। সুজয় রাজী হয়ে গেল। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। ঘুরে এলে মন্দ হয়না। কাজেই উনি ভোর ছটার মধ্যে নিশ্চিতভাবে এসে উপস্থিত হবেন।

সুজয় হাই তুলতে তুলতে বালিশে মাথা রাখল।

প্রবল দরজা ধাক্কায় সুজয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রথীন মিত্র ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছেন। চাকরটা গিয়ে দরজা খুলে দিল। সুজয় ঘুম জড়ান চোখে বিছানা থেকে নামার মুখেই দেখা হল তাঁর সঙ্গে। দীর্ঘকায়; সবল পুরুষ। বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে বা সবে অতিক্রম করেছে।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কি মশাই বলেছিলাম না, ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা আপনার কর্ম নয়।

—লিখতে লিখতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, তৈরী হয়ে আসছি।

পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিলেও, সময় লাগল তার চেয়ে অনেক বেশী। কুড়ি মিনিট পরে সুজয় তৈরী হয়ে এল। ষ্টাডি রুমেই দেওয়ালের সঙ্গে আয়রন চেষ্ট আছে। ওঘর বিশেষভাবে সুরক্ষিত। প্রতিটি জানলায় কাঠের পাল্লা ও রড থাকা সত্ত্বে কলাপসেবিল সংযুক্ত। দরজাতেও ওই একই ব্যবস্থা। দরজা জানলা ভাল ভাবে পরীক্ষা করে নিয়ে চাকর ত্রিলোককে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে সুজয় গাড়ীতে গিয়ে বসল। বারবিঘা তখনও ভাল করে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেনি। রথীনবাবু ষ্টার্ট নিলেন। প্রায় জন বিরল পথের উপর দিয়ে ছুটে চলল ষ্টেশন ওয়াগান।

সুজয় বলল, প্রায় দুবছর পরে বারবিঘার বাইরে পা বাড়াচ্ছি।

—বলেন কি! কোথাও যান নি?

—না। ইচ্ছে করেই যায় নি। তবে আগামী মাসের প্রথম

দিকে কলকাতা না গেলেই নয়। আমার একটা গল্প সিনেমা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তাই-নাকি? দারুন সুখবর।

—এতটা আশাবাদী হবেন না। গল্প ফ্লোরে না যাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। এক লক্ষ কথাবার্তার পর নাকি একটি মেয়ের বিয়ে হয়। আমার মতে পাঁচ লক্ষ কথাবার্তার পর একটা গল্প চিত্র রূপ পায়। আমি তাই এখনও ভরসা করতে পাচ্ছি না।

রথীন মিত্র প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

—এখন কি লিখছেন?

—এখানকার কায়স্থ সমাজকে কেন্দ্র করে একটা লেখা আরম্ভ করেছি। আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনার কখন গল্পটল্প লেখার ইচ্ছে হয়নি?

—আমার?

ষ্টিয়ারিং আরো জোরে চেপে ধরে গলা-ফাটিয়ে হাসলেন তিনি।

—না মশাই, ক্ষমতার বাইরে কখন পা বাড়াই না। আমার মগজে সারাল পদার্থের একান্তই অভাব। তবে আমাকে একজন ভাল পাঠক বলতে পারেন। ভাল শ্রোতাও।

—ভাল পাঠক আর ভাল শ্রোতা তো ক্রমেই কমে আসছে।

—আমি কি রকম শ্রোতা যদি প্রমাণ চান তো বলুন?

সুজয় হাসল।

—আমার এক বন্ধুর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই বলে যাব। গল্পের সত্যতা সম্পর্কে কোন গ্যারাণ্টি চাইবেন না কিন্তু।

—তাই হবে। আরম্ভ করুন।

রথীন মিত্র সামনের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেই আরম্ভ করলেন।

ধরা যাক ছেলেটির নাম রমেন। নিজের কুলে তার কেউ নেই। মামার সংসারে উপেক্ষা অবজ্ঞায় মানুষ। তবে সে পরিশ্রমী ছেলে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাট্রিক পাশ করে গেছে। মামা

বললেন, আর পড়াতে পারব না। এবার চাকরী বাকরি দেখ।

রমেন জানে ম্যাট্রিক পাশ করে আর যাই হোক চাকরী হয় না। অবশ্য মুরুব্বির জোর থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু তার মুরুব্বি কোথায়? অনেক ধার করে দুটো টিউশানি পাওয়া গেল। তারই উপর নির্ভর করে আবার সে পড়া চালিয়ে যেতে লাগল। বাপ মা তাকে কপর্দক শূন্য অবস্থায় পথে বসিয়ে গেলেও, সে মানুষের মত মানুষ হয়ে টাকার পাহাড় সৃষ্টি করবে এই তার প্রতিজ্ঞা। আপাততঃ গ্র্যাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত পড়াশুনা থেকে ক্ষান্ত দেবে না।

শেষ পর্যন্ত সেই সুদিন এল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা এতদিনে সার্থক। রমেন বি. এ. পাশ করে গেছে। এই সংবাদকে মামা কিন্তু খুব ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। একে সে তাঁর বিনা সাহায্যে সাফল্য অর্জন করেছে, দ্বিতীয়ত, তাঁর দুই ছেলে গত কয়েক বছর ধরে রগড়াচ্ছে ক্লাশ টেনেই। অগত্যা তাঁকে পরিষ্কার মতামত দিতে হল। যার সার মর্ম হল, রমেন এবার ঘাড় থেকে নেমে যাক।

রমেনের আর ভাবনা নেই। অচিরেই এবার সে নিজের একটা হিল্লে করতে পারবে। তারপর আরম্ভ হবে তার টাকার সাধনা। মুখের ধাক্কায় মামার বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হলেও মন খারাপ করল না। বেনারস থেকে এসে পৌঁছাল দিল্লীতে। বাবার একটা আংটি কাছে ছিল। সেটা বিক্রী করে পাথেয় সংগ্রহ করেছে। ভাগ্য পরীক্ষা রাজধানীতেই আরম্ভ করবে।

দিল্লী পৌঁছে কয়েক দিনের মধ্যে হাড়ে হাড়ে বুঝলো রমেন, ম্যাট্রিক পাশ ও গ্র্যাজুয়েট হবার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। হাজার হাজার বেকার মানুষ মাষ্টার ডিগ্রী পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং অফিসের দরজায় মাথা খুঁড়ে বেড়ালেও, চাকরী দূর দূরস্ত। পনেরো দিন যেতে না যেতেই পেটের সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়ে দেখা দিল। পকেটে তখন দেড় টাকা অবশিষ্ট।

ধর্মশালা পাল্টে পাল্টে এ'কদিন রাত কাটিয়েছে। এখন সেখানেও স্থান পাওয়া সমস্যা হবে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় দু' মাস কেটে গেছে এরপর।

রমেনকে দেখলে এখন ভিখারী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ছেঁড়া জামা কাপড় গায়ে, চেয়ে চিন্তে পেট চলে। কতদিন খাওয়াই জোটে না। রাত্রে পার্কে শুয়ে থাকে আর পুলিশের গুঁতো খায়। এখন রমেনের প্রায়ই মনে হয় কুতুব মিনার থেকে লাফিয়ে পাড়ার কথা। কি হবে আর বেঁচে থেকে। এই সমস্ত কথাই সেদিন আজমীর গেটের কাছে বসে ভাবছিল।

হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা খবর কাগজের উপর। কেউ ভুল করে ফেলে গেছে নিশ্চয়। নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য রমেন কাগজটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল ছোট একটা বিজ্ঞাপনে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য লোক চাওয়া হয়েছে। সুস্থ শরীর ও গ্র্যাজুয়েট হলেই চলবে। আবদনের প্রয়োজন নেই। প্রার্থী স্বয়ং গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারেন। সাক্ষাতের সময় সকাল দশটা থেকে বারটা।

বিমর্ষভাবে অনেকক্ষণ বিজ্ঞাপনের দিকে রমেন তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে কত প্রার্থীই পেঁৗছে গেছে ওখানে। হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার একবার চেষ্টা করে দেখবে। খালি পেটে থেকেও শরীর এখন বিশেষ কৃশ হয়নি। জামা কাপড়ের অবস্থা অবশ্য শোচনীয়—তা হোক। ভাগ্যকে আরেকবার ঠুকে দেখবে।

এখন বেলা নটার বেশী হবে না। রমেন হাঁটতে আরম্ভ করল। বহুক্ষণ পরে ঝাঁঝাঁ রুদ্দুর মাথায় করে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পেঁৗছাল। জু গার্ডেনের লাগোয়া একটা বাড়ী। ঢোকার মুখেই দারোয়ান বাধা দিল।

—আমি চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিলাম।

দারোয়ান গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, বি. এর সার্টিফিকেট আছে?

—আছে।

—ভেতরে যান।

দুরু দুরু বক্ষে রমেন ভেতরে ঢুকলো। আর কোন উমেদারকে না দেখে কিছুটা আশান্বীতও হল। একটা দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছিল। একটু ইতস্তত করে, পর্দা সরিয়ে ঘরে পা দিতেই লক্ষ্য করল, তিনজন জাঁদরেল চেহারার লোক গম্ভীর মুখে বসে আছেন। এঁরাই নিশ্চয় ইণ্টারভিউ নেবেন।

—আসুন।

ইণ্টারভিউ আরম্ভ হয়ে গেল। নাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করার পর তাকে খেলাধুলা সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রশ্ন করা হল। হাঁটিয়ে, দৌড় করিয়ে, ডিগবাজি খাইয়ে তার শারীরিক পটুতার পরীক্ষাও নিলেন ওঁরা। ইংরাজী ও বাংলা উচ্চ গ্রামে পড়িয়ে দেখে নেওয়া হল গলার স্বর কাঁপছে কিনা। এবার একজন বললেন, আপনাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে। মাইনে দুশো টাকা পাবেন। খাওয়া থাকার জন্য এক পয়সা খরচ করতে হবে না। সে দায়িত্ব আমাদের। তবে—

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করতে লাগল রমেনের সবুরে সত্যি মেওয়া ফলে তাহলে! কিন্তু ভদ্রলোক তবে বলে থামলেন কেন?

তিনি আবার বললেন, আজকালকার ছেলেদের বড় খুঁত খুঁতে স্বভাব। নাক সিঁটকেই আছে। আপনার হয়তো কাজ পছন্দ নাও হতে পারে। তবে এরকম আরামের চাকরী সারা দেশে আর পাবেন না।

সবিনয় রমেন বলল, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাণপণ করব।

—নামমাত্র দায়িত্ব। শুয়ে বসে আর মাঝে মধ্যে একটু পায়চারী করতে পারলেই হল। ডিউটি আওয়ার্সে যত খুশী ঘুমিয়ে নিতে পারেন। কাজটা হল, আপনাকে বাঘ সেজে খাঁচার মধ্যে থাকতে হবে।

—বাঘ !!!

এবার আরেকজন বললেন, 'জু গার্ডেনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা কিছুদিন হল মারা গেছে। আমরা অবশ্য অর্ডার দিয়েছি। বাংলা সরকার খবর পাঠিয়েছেন সুন্দরবনে ফাঁদ পাতা হয়েছে। ধরা পড়লেই পাঠিয়ে দেবেন। এদিকে জনমত ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দর্শক বাঘ দেখতে না পেয়ে ক্ষেপে উঠছে। তারা পোষ্টার দিচ্ছে। বোমা-টোমাও চার্জ করে বসতে পারে যে কোন দিন। তাই—

—কিন্তু আমি কি ভাবে—

—সে ব্যবস্থা আছে। মরা বাঘের ছালটা আপনার গায়ে ফিট করে দেওয়া হবে। অবশ্য এ সমস্ত আপনাকে গোপন রাখতে হবে। রাজী আছেন তো ? তোফা চাকরী ইয়াংম্যান।

রমেন চিন্তা করে দেখল চাকরী নিয়ে বাছবিচার করার কোন মানে হয় না। ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেই অনাহারে মরতে হবে। তাছাড়া বাঘ সাজা এমন আর কি মন্দ কাজ। রাজী হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই ডিউটি আরম্ভ হয়ে গেল রমেনের।

প্রথমে নার্ভাসনেস বোধ করলেও, অচিরেই সে নিজেকে সামলে নিল। অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের খুব কাছ ঘেঁসে দর্শকরা এসে দাঁড়ান। বাঘ বলে তার খাঁচার একটু দূরে থেকেই তাঁরা উঁকি-ঝুঁকি মারেন। রমেন মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে। একটু আধটু ঘুরপাক খেয়ে শুয়ে পড়ে গিয়ে। গরমেও তেমন কষ্ট হয় না। পাশের খাঁচাতেই আছে বিরাট পোলার রিয়ার—মেরু ভাল্লুক। সে যাতে অসুবিধা বোধ না করে তাই চাঁই চাঁই বরফ আছে সেখানে। কাজেই রমেন ঠাণ্ডা আমেজ পায়। চাকরীটা এখন তার ভালই লাগছে। সুন্দরবন থেকে বাঘ এসে পড়লেও চাকরী যাবে না। বেশী সংখ্যক বাঘ জু গার্ডেনে থাকলে দর্শকরা খুশীই হন একথা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মাস খানেক কেটে গেল।

সেদিন প্রচণ্ড গরম। দর্শকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। রমেন দেওয়াল ঠেস দিয়ে ব্যাঘ্র ভঙ্গীতে বসে ঘামছিল। মেরু ভাল্লুকের খাঁচায় বরফ গলে যাওয়ায় এই দুর্বিপাক। ভাল্লুকটাও ছটফট করছে। হঠাৎ সে এগিয়ে এল দুই খাঁচার মধ্যেকার দরজাটার কাছে। তারপরই হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। রমেন সত্রাসে দেখল বিরাট ভাল্লুকটা তার খাঁচায় ঢুকছে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল তার। বাঘের ডাক ভুলে সে অর্থহীন চীৎকার করে উঠল।

ভাল্লুকটা হেলতে দুলতে হিংস্র মুখে এগিয়ে আসছে। আর রক্ষা নেই। পিষে মেরে ফেলবে। রমেন পাকসাট খেয়ে অন্যদিকে চলে গেল। পাগলের মত ডাকতে লাগল ডোমেদের। বন্দুক নিয়ে কেউ ছুটে এলেই এখন রক্ষা পাওয়া যায়।

জন্তুটা তার খুব কাছে এসে পড়েছে।

রমেন কেঁদে ফেলল।

এই সময় মেরু ভাল্লুক পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট।

উচ্চ হাস্যে রথীন মিত্র গল্প শেষ করলেন।

সুজয় হাসতে হাসতে বলল, আমাদের হাসি পেলেও গল্পটা কিন্তু করুন।

এইভাবে নানা গল্প-গুজবের মধ্যে দিয়ে সময় এগিয়ে চলল। নরম জল হাওয়ায় মোটর ভ্রমণ ভালই লাগছিল। পাটনায় দুজনে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল।

আরো পথ অতিক্রান্ত হল ক্রমে।

রঘুনাথপুরও পার হয়ে গেল। বেলা বেশ চড়ে গেছে।

সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই রথীন মিত্র বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

—কি বলুন তো?

—ডাউনে কোন গাড়ী আসছে না। আমি অনেকক্ষণ থেকে

লক্ষ্য করছি, ওধার থেকে কোন প্রাইভেট কার বা লরি একেবারেই আসছে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? বলতে গেলে জি. টি. রোড টোয়েণ্টিফোর আওয়ার্স বিজি থাকে।

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে সুজয় বলল, তাই তো! নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে।

—কারণটা আমাদের এখন জানতে হবে।

গুরুতর কারণই বিদ্যমান। আরো কিছুদূর এগুবার পর জানা গেল সব কিছু। ডুমরাও প্রবেশ করার মুখে জন দশেক লোককে রাস্তার ধার দিয়ে কথা বলতে বলতে আসতে দেখা গেল। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তারা উত্তেজনার চরমে গিয়ে পেঁীছেছে।

মিত্র বললেন, এদের জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

তিনি ষ্টেশন ওয়াগানের গতি মন্হর করলেন।

প্রশ্ন করলেন একজনকে, ওধার থেকে কোন গাড়ী আসছে না কেন আপনারা কেউ বলতে পারেন?

একজন মোটাসোটা লোক বলল, আসবে কি করে, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। রেলের গেট বন্ধ হয়ে রয়েছে যে।

—বন্ধ! বন্ধ কেন?

—আপনারা শোনেনিন, পাঞ্জাব মেল উল্টে গেছে—

কথাটা শুনেই দুজনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তারপর ওদের কাছ থেকে ঘটনার মোটামুটি বিবরণ জানতে পারা গেল। শেষ রাত্রে মেল যখন ডুমরাও ষ্টেশন অতিক্রম করছিল তখনই অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে যায়। কয়েকখানা বগি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের অবস্থাও তথৈবচ। অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে।

গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলেন রথীন মিত্র। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক মর্ম্মবিদারক পরিস্থিতির মধ্যে পেঁীছান সম্ভব হল। লেভেল ক্রশিং বন্ধ থাকায় অজস্র গাড়ী দুধারে কয়েক সারিতে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকেই দেখা যায়, মেল ট্রেনের মাত্র তিনটি বগি লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বাকী সমস্ত ছিটকে গেছে এধার ওধার। বিরাট কানাডিয়ান ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একধারে।

কোন কোন মৃতদেহ অবিশ্বাস্য দূরত্বে গিয়ে পড়েছে। প্রাণহীন রক্তাক্ত কলেবর দেহগুলিকে পিরামিডের আকারে গাদা করে রাখা হয়েছে এখানে ওখানে। খানা, খন্দ ও ডোবার মধ্যে থেকে আরো দেহের সন্ধান করা হচ্ছে।

চতুর্দ্দিককে গিস গিস করছে পুলিশ।

কান্না আর বিলাপে ভরে গেছে আকাশ বাতাস। অনেকে তাদের প্রিয়জনদের খুঁজ বেড়াচ্ছে। আহতদের সেবার জন্যও তৎপরতার অভাব নেই। স্ট্রেচার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে। মর্ম্মান্তিক এই সংবাদ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ার পরই আসপাশের মানুষ ছুটে এসেছে। তাদের সংখ্যা হাজার পাঁচেকের কম কখনই হবে না।

সুজয় কখনও কল্পনাও করেনি, এমন একদিন আসবে যেদিন তাকে এইরকম দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এখন সে শুধু ভাবছে, এতগুলো নিশ্চিন্ত মানুষকে মৃত্যু কত দ্রুত গ্রাস করেছে। কণামাত্র অবকাশ দেয়নি সতর্ক হবার। রথীন মিত্রের মুখেও কথা নেই। দুহাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং চেপে তিনি সামনের দিকে চেয়ে আছেন।

সুজয় বলল, চলুন নামা যাক।

—নামবেন?

—এগিয়ে একটু দেখে আসি।

রথীন মিত্র আর কিছু না বলে গাড়ী থেকে নামলেন। সুজয়ও নেমে পড়ল।

ষ্টেশন ওয়াগান থেমে ছিল কিছুটা দূরে। সামনে আরো গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকায় আর এগুতে পারেনি। সেখানে লোকজন নেই

বললেই চলে। কিন্তু দুজনে যত লেভেল ক্রশিংএর দিকে এগুতে লাগল, গা বাঁচান তত দুষ্কর হয়ে উঠল।

এই সময় কনট্রাক্টার পৃথ্বিপালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সর্দারজী সুজয়কে দেখে অবাক।

—ব্যানার্জীবাবু, আপনি এখানে ?

—বেনারস যাচ্ছিলাম। কি বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে বলুন তো ? অ্যাক্সিডেণ্ট কিভাবে হল, শুনেছেন কিছু ?

—অনেক খোঁজ নিয়েও সঠিক খবর পাচ্ছি না। নানা লোক নানা কথা বলছে। ষ্টেশনে গেলে আসল ব্যাপারটা জানা যায়। কিন্তু ওখানে তো যেতে দিচ্ছে না।

—রিলিফ কার এসেছে নাকি ?

—কিছুক্ষণ হল এসেছে।

ভীড় ক্রমেই বাড়ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ধারের কাজে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল পুনঃপুনঃ। অনন্যপায় হয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ আরম্ভ করল এই সময়। অবস্থা চরম বিশৃঙ্খল পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল। যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাতে আরম্ভ করছে।

অর্থহীন চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক।

সুজয়, রথীন মিত্র ও পৃথ্বী পাল নিরাপদ জায়গায় সরে এল।

মিত্র বললেন, এখানে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। বেনারস যাওয়া আজ সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। চলুন, ফিরে যাওয়া যাক।

সুজয় বলল, লাইন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত লেভেল ক্রসিং-এর গেট খুলতেই পারে না। সে এক অনিশ্চিত ব্যাপার। ফেরাই যাক। কে ভেবেছিল, এরকম হৃদয় বিদারক ব্যাপারের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। মিঃ সিং, আপনি এখানেই থাকবেন না, বারবিঘায় ফিরবেন ?

সুজয়ের বাড়ী পৃথ্বীপালের তত্ত্বাবধানেই তৈরী হয়েছে। তার কাজকর্ম নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকলেও, স্থায়ী আবাস বারবিঘাতেই।

সে বলল, আমার আর এখানে কাজ কি? একটা দরকারে রঘুনাথপুরে এসেছিলাম। অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। এবার বারবিঘায় ফিরব।

—আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে আসুন।

—ভালই হল। এখান থেকে ফেরার কিছু পেতাম কিনা সন্দেহ।

তিনজনে গাড়ীর কাছে পৌঁছাল।

সেখানে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। জন কুড়ি লোক ষ্টেশন ওয়াগানের উপর ঝুঁকে রয়েছে। হুমড়ি খেয়ে কি যেন দেখছে বললেই ঠিক বলা হয়। তিনজন গিয়ে পড়তেই সরে গেল তারা। তখন দেখা গেল, একটি তরুণী মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে আছে। কপালে আঘাতের চিহ্ন। হাতের এখানে ওখানে ছড়ে যাওয়ার একাধিক দাগ।

সাজ পোষাক দেখে তরুণীটিকে পাঞ্জাবী বলেই মনে হয়।

ষ্টেশন ওয়াগানের গা ঘেঁসে পড়ে আছে সে।

দু'পা পিছিয়ে এল সুজয়। রথীন মিত্রও।

পৃথ্বীপাল প্র্যাকটিকাল লোক। সে দ্রুত গলায় বলল, ট্রেন থেকে ছিটকে গিয়েছিল মনে হচ্ছে। জ্ঞান হবার পর কোন রকমে এখানে চলে এসেছে।

সুজয় নিজেকে সামলে নিয়েছে।

বলল আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখছি।

রথীন মিত্র বললেন, মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে। আসুন ফেরা যাক।

—সেকি! পৃথ্বীপাল বলল, মেয়েটিকে আমরা এখানে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাব?

—কি করা যাবে বলুন?

—কিছু একটা তো করতেই হবে।

সুজয় বলল, মনুষত্বের দৃষ্টি কোণ দিয়ে দেখতে গেলে, কিছু

একটা করতেই হয় মিঃ মিত্র। মেয়েটির অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে দেখুন।

মিত্র ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে সব সময় চলে না। যা করতে চান তাড়াতাড়ি করুন।

—আপনিই বলুন না কি করা যায়?

—আমার মতে রেল পুলিশকে খবর দেওয়াই ভাল। তারা বডি তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করবে।

পৃথ্বীপাল গলায় জোর দিয়ে বলল, এখন আমাদের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দিতে হবে। দেখছেন কি রকম বিশৃঙ্খলা চলেছে। আমার তো মনে হয় না এতে মেয়েটির কোন সুবিধা হবে। বরং হিতে বিপরিত হতে পারে।

—কেন?

—একেই দিন কাল খারাপ পড়েছে, তারপর এরকম বিশৃঙ্খলা। এখন কে কার খোঁজ রাখছে। অল্প বয়সী মেয়ে সে যে লোপাট হয়ে যাবে না কে বলতে পারে? মাস ছয়েক আগেকার অ্যাক্সিডেণ্টের কথা কাগজে পড়েছিলেন তো? কত মেয়ে আর মালপত্র লুট হয়েছিল তার হিসাব পর্যন্ত করা যায় নি।

সুজয় চিন্তিত গলায় বলল, কি করা যায় তাহলে? আচ্ছা, কোন ডাক্তারখানায় একে নিয়ে গেলে হয় না?

—ডাক্তারখানা—

—হ্যাঁ। জ্ঞান ফিরে এলে মেয়েটি এখানে এসে নিজের আত্মীয় পরিজনদের খুঁজে নিতে পারবে।

—মন্দ প্রস্তাব নয়। তবে এই গ্রামে ডাক্তারখানা পাবেন বলে মনে হয় না। কাছাকাছির মধ্যে আরায় হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা ডাক্তারখানা সবই আছে। ইচ্ছে করলে ওখানে যাওয়া যেতে পারে।

সুজয় মেয়েটির শোচনীয় অবস্থার জন্য অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল। তার নরম মনে গুমরে উঠেছিল একটা ব্যথা।

সে বলল, আর যখন কোন উপায় নেই, তখন ওখানেই নিয়ে যাওয়া যাক।

গম্ভীর গলায় মিত্র বললেন, আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না। আপনারা আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করছেন।

যাই হোক, মেয়েটির দেহ স্টেশন ওয়াগনে তোলা হল। মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি আবার পথে ফিরে চলল। কারুর মুখে কথা নেই। ইচ্ছে করেই কেউ যেন কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। অসম্ভব গম্ভীর মুখে রথীন মিত্র ষ্টিয়ারিংয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। সুজয় ও পৃথ্বীপাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ঘন ঘন। এরকম অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে কে কল্পনা করেছিল। মেয়েটি মূর্ছিত অবস্থায় পিছনের সিটে পড়ে রয়েছে।

পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি অগ্রসর হচ্ছিল। সুতরাং আরা পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগল না। হাসপাতালে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা এই প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল এই সময়। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েটির সম্পর্কে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হতে পারে। সুতরাং হাসপাতালে যাওয়া চলতে পারে না। পৃথ্বীপালের নির্দেশে স্টেশন ওয়াগন গিয়ে থামল এক নার্সিং হোমের সামনে গিয়ে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচার এসে গেল।

মেয়েটিকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভেতরে। নার্সিং হোমের কর্তা ডাঃ শ্রীবাস্তব উপস্থিত ছিলেন। নানা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিবেচনা করে ডাক্তারকে প্রকৃত ঘটনা না বলে, উপর থেকে অকস্মাৎ পড়ে যাওয়ার একটা কাহিনী বর্ণনা করল পৃথ্বীপাল।

ডাঃ শ্রীবাস্তব কেবিনে চলে গেলেন রুগীকে পরীক্ষা করতে।

ফিরে এলেন মিনিট কুড়ি পরে।

সুজয় প্রশ্ন করল, কেমন দেখলেন ডক্টর ?

শ্রীবাস্তব হাতের স্টেথিসকোপটা কোটের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, ক্ষত খুব গভীর নয়। ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে।

আচ্ছন্নের মত ভাবটা অনেক কেটে গেছে। আমার মতে আজ ওঁকে রেস্ট দেওয়া দরকার।

—বেশ তো। ওঁকে এখানে রাখতে গেলে আমাদের কি করতে হবে বলুন? সুজয়ের কথার উত্তরে ডাক্তার বললেন, বিশেষ কিছুই করতে হবে না। অফিস-রুমে গিয়ে নামটা এনরোল করিয়ে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিন।

কথা শেষ করে ডাক্তার আর কোন রুগীকে অ্যাটেন্ড করতে গেলেন বোধ হয়। বারান্দার একধারে অফিস-রুমের দরজা দেখতে পাওয়া গেল। তিনজনে ভেতরে গেল। সেখানে আরেক সমস্যার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হল। রেজিস্টারে কালম করা ছিল। নিয়মমত কালমগুলো ভরবার জন্য উদ্যত হল কাউন্টার ক্লার্ক।

—রোগিনীর নাম?

নাম! তিনজনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। মেয়েটির একটা নাম আছে নিশ্চিত। কিন্তু কি সে নাম? তিনজনের মধ্যে কারুর তো জানা নেই। অথচ চুপ করে থাকবার উপায় নেই, নাম একটা লেখাতেই হবে। এবং এমন ভাব প্রকাশ করতে হবে যাতে কাউন্টার-ক্লার্কের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয়। সে যেন বুঝতে না পারে মেয়েটিকে তারা কুড়িয়ে এনেছে। সে একজনের বিশেষ উপকার করতে চলেছে, এতক্ষণ এই মনোভাবে বিভোর ছিল সুজয়। এখন ক্লার্কের একটি মাত্র প্রশ্নে সেই মনোভাবের উপর বিব্রতবোধ প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

—কি হল, নাম বলুন।

পৃথ্বীপাল বলে উঠল, লিখুন, শেলা।

—পদবী?

—পদবীর কি দরকার? দেবী লিখুন।

—আপনাদের মধ্যে যিনি ভদ্রমহিলার আত্মীয়, এখানে সই করুন। ক্লার্ক খাতার এক জায়গায় আঙুল নির্দেশ করল।

আত্মীয়! আর এক সমস্যা। তাদের তিনজনের মধ্যে কে

শেলার আত্মীয় হবে? রথীন মিত্র পথনির্দেশ করে দিলেন। তিনি প্রথম থেকে চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, সুজয়বাবু, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। সইটা করে দিন।

সুজয় কিছু বলতে গিয়েও বলল না। এগিয়ে গিয়ে সই করে দিল নির্দিষ্ট জায়গায়। ত্রিশ টাকা অ্যাডভান্স দিতে হল। রসিদ নিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এল নার্সিং হোমের বাইরে।

মিত্র বললেন, আমি কিন্তু এবার বারবিঘা ফিরব।

—সেকি! সুজয় আশ্চর্য হয়ে বলল, আজ থেকে যান। কাল একসঙ্গে না হয়—

—আমার পক্ষে অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বেনারস যাওয়া হল না। কোয়ার্টারে ফিরে গোটাকয়েক অন্য কাজ সেরে রাখি।

ওঁর কথা বলার ভঙ্গী দেখে মনে হল উনি হাজার অনুরোধেও আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। সুজয় আর কিছু বলল না। মিত্র স্টেশন ওয়াগনে স্টার্ট নিলেন।

উনি চলে যাবার পর পৃথ্বীপাল বলল, ভদ্রলোক যেন পালিয়ে বাঁচলেন। কত রকম লোক যে পৃথিবীতে আছে—

—সত্যি কথা বলতে কি আমিও যে অস্বোয়াস্তি বোধ করছি না তা নয়। কি রকম উটকো ঝামেলা এসে পড়ল বলুন তো? যাক, আর ও-কথা ভেবে লাভ নেই।…এখানে কোন হোটেলের সন্ধান জানেন?

—হোটেল! আপনি কি কোন আপ-টু-ডেট হোটেলের কথা বলছেন?

—মানে…এক রাত্তির মাথা গোঁজবার মত ভদ্রগোছের হোটেলে আর কি। পৃথ্বীপাল হেসে বলল, ভদ্র কথাটা বাদ দিলে মাথা গোঁজবার মত হোটেলের অভাব এখানে হবে না। মৈথিল বামুনরাই হল এখানকার হোটেল-ব্যবসার একচ্ছত্র অধিপতি। সেখানে একটা চৌকি পেতে পারেন; অবশ্য ওই সঙ্গে হাজার

খানেক ছারপোকাও পাবেন।

—অর্ধেক রক্ত তো তাহলে এখানেই রেখে যেতে হবে। রাতটা কোথায় কাটানো যায় বলুন তো?

—এখন হাতে অনেক সময় আছে। পরে ভেবে দেখলেও চলবে। চলুন, আগে দুপুরের খাওয়াটা কোথাও গিয়ে সেরে নেওয়া যাক।

সমস্ত দিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে শহরময় রিক্সার চক্কর দিয়ে বেড়াল ওরা দুজনে। সন্ধ্যার পর আশ্রয় নিল স্টেশনে। অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছে আজকের রাতটা ওয়েটিং-রুমেই কাটিয়ে দেবে। এই দুরবস্থার জন্যে সময় সময় সুজয়ের নিজের উপর অনুকম্পা হচ্ছিল। এতবড় শহরে কোথাও মাথা গোঁজবার জায়গা পাওয়া গেল না, আশ্রয় নিতে হল শেষ পর্যন্ত স্টেশনে!

অবশ্য স্বল্প-আয়াসেই আরামে রাত কাটাবার পথ খোলা ছিল। সে খ্যাতিমান পুরুষ। কিছু পাঠক-পাঠিকা তার এখানে আছেনই। তার আগমন সংবাদ স্থানীয় বাঙালী ক্লাবে পেঁছলে আর দেখতে হত না। কিন্তু ও-পথ মাড়াল না সুজয়। কি দরকার?

আধো-ঘুমের মধ্যে চেয়ারে বসে রাত কেটে গেল। বিস্ময়ের বিষয় হলেও চেয়ারে ছারপোকার সন্ধান তেমন পাওয়া না গেলেও মশার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি। ঢালাও ফলারের ব্যবস্থা থাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ তারা চালিয়ে গেছে।

মুখ-হাত ধুয়ে কেলনারে সামান্য কিছু জলযোগ করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল স্টেশন থেকে। প্রায় ছ'টা বাজে। অল্প কিছু লোক-চলাচল আরম্ভ হয়েছে রাস্তায়। সুজয়ের চোখ করকর করছে; শরীরে কিছু নেই মনে হচ্ছে। পৃথ্বীপালেরও ওই এক অবস্থা।

রিক্সায় চেপে নার্সিং হোমে পেঁছতে মিনিট পনেরোর বেশী লাগল না। ওখানকার দরজা তখনও খোলেনি। বাইরের পাহারারত দরওয়ানের কাছ থেকে জানা গেল, ডাঃ শ্রীবাস্তব সাড়ে

সাতটার সময় আসেন। তার আগে এখানকার কোন কাজ-কর্ম আরম্ভ হয় না।

অগত্যা সঞ্জয় ও পৃথ্বীপাল সময় কাটাবার জন্যে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। নার্সিং হোমে ফিরে এল পৌনে আটটার সময়। ডাঃ শ্রীবাস্তব তখন এসে পড়েছিলেন। ওদের দেখে বললেন, পেশেন্ট কাল রাত্রে ভাল ভাবেই ঘুমিয়েছেন। তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হয়।

পৃথ্বীপাল বলল, কথা-টথা কিছু বলছেন?

—খুব কম। কাল সন্ধ্যাবেলা শুধু প্রশ্ন করেছিলেন, এখানে কেন তাঁকে আনা হয়েছে। আসুন, তাঁর কেবিনে যাই।

শ্রীবাস্তবকে অনুসরণ করে দুজনে শেলার কেবিনে গেল। সে তখন বিছানার উপর বসে জানলার দিকে তাকিয়েছিল। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল। মনের মধ্যে উত্তেজনা বজায় থাকায় গত কাল ভাল করে শেলাকে দেখেনি সঞ্জয়। এখন দেখল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রং। সুশ্রী মুখ। বিশেষে মোহময় চোখ দুটি মানুষকে আকর্ষণ করে। বেণীবন্ধ রুক্ষ চুল দেখলে মনে হয় দিন দুয়েক তেল বা চিরুনী পড়েনি মাথায়।

ডাক্তার বললেন, এঁরা এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

পৃথ্বীপাল বলল, কেমন আছেন এখন?

শান্তগলায় সে বলল, ভাল।

—এখান থেকে এবার যেতে হবে। আপনি কি যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছেন?

—যেতে হবে? কোথায়?

—ডুমরাও। আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে।

—কিন্তু আপনারা কে?…আমি তো…

মনে হল একটা সন্দেহ যেন ডাক্তারের চোখে ঘনিয়ে আসছে।

তিনি দ্রুত গলায় বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো? মনে হচ্ছে উনি যেন আপনাদের চিনতে পারছেন না।

সুজয় বলল, আমরাও আশ্চর্য হচ্ছি ডক্টর। কিছু যদি মনে না করেন—কয়েক মিনিটের জন্যে কেবিনের বাইরে গেলে…

—ও, সিওর !

শ্রীবাস্তব কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বেডের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুজয় বলল, আমাদের না-চিনতে পারার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনাকে যখন এখানে তুলে আনা হয়, তখন আপনার জ্ঞান একেবারেই ছিল না।

—আমার কি হয়েছিল ?

—ট্রেন থেকে আপনি ছিটকে পড়েছিলেন।

অসংলগ্ন গলায় শেলা বলল, ট্রেন থেকে….এ সমস্ত কি বলছেন …আমি তো…

—অমৃতসর মেলে আপনি ট্র্যাভল করছিলেন। কলিশন হয়ে গেছে ডুমরাওর কাছে। আপনি…

—কি সমস্ত বলছেন ! আমি তো অমৃতসর মেলে চড়িনি। আমি…

সুজয় ও পৃথ্বীপাল দুজনেই হতবাক।

—কিন্তু আমরা যে দুর্ঘটনা স্থল থেকে আপনাকে আহত অবস্থায় পেয়েছি।

দুহাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল শেলা।

—কিন্তু আমি--আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। মেল ট্রেন….ডুমরাও...

কোথায় এই ডুমরাও ?

—বিহারের একটা গ্রাম। বর্তমানে আপনি আরায় আছেন।

—বিহার ! আমার তো কিচ্ছু মনে পড়ছে না—

শেলার গলায় অসহায় ভাব।

পৃথ্বীপাল ও সুজয়ের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল। তাদের চোখের কানায় কানায় বিস্ময়। পৃথ্বীপাল কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল।

সুজয় নীচু গলায় বলল, আশ্চর্য ব্যাপার ডাক্তারবাবু। উনি কিছুই মনে করতে পারছেন না।

—সেকি!

শ্রীবাস্তব ঝুঁকে পড়লেন পেশেন্টের উপর।

শেলা করুণ গলায় বলল, এঁরা কি সমস্ত বলছেন ডাক্তাববাবু, আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন, আপনি আহত হয়েছিলেন। এঁরা আপনার আত্মীয়। এঁদের চিনতে পারছেন না?

—আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না ডাক্তারবাবু। এ কি হল আমার! আমি তো···

প্রায় মিনিট দুয়েক শেলার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থেকে শ্রীবাস্তব বললেন, আচ্ছা, আপনার নামটা কি বলুন তো?

—নাম?

—হ্যাঁ, নিজের নাম।

ব্যাণ্ডেজ-লাগানো কপালের ক্ষতস্থানটায় হাত বুলোতে বুলোতে বহুদূর থেকে ভেসে আসা গলায় শেলা বলল, নাম! সত্যিই তো, কি নাম আমার?

—নাম মনে পড়ছে না আপনার?

—না। একেবারেই না। আমার কি নাম ডাক্তারবাবু?

চোখের ইশারায় সুজয় ও পৃথ্বীপালকে বাইরে আসতে ইঙ্গিত করে শ্রীবাস্তব কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুজনে ওঁকে অনুসরণ করে বাইরে এল।

—কি বুঝছেন ডক্টর? সুজয় প্রশ্ন করল।

—আমার মনে হয় প্রকৃত ব্যাপারটা আপনিও আঁচ করেছেন। কেসটা এরকম দাঁড়াবে আমি ভাবতে পারিনি। উপরের চামড়া সামান্য কেটে গেলেও, স্নায়ুর উপর আঘাত লেগেছে প্রচণ্ড। উনি নিজের অতীতকে ভুলে গেছেন।

শেলার হাব-ভাব ও কথাবার্তা শুনে এই রকম একটা ধোঁয়াটে

সন্দেহ সুজয়ের মনে যে ঘোরাফেরা না-করছিল তা নয়। ডাক্তারের কথায় সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। একটা জমাট নিশ্বাস তার বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। নিয়তির এ কি পরিহাস! সুস্থ, আনন্দিত মন নিয়ে মেয়েটি রওনা হয়েছিল, হয়তো এমন জায়গায় যাচ্ছিল যা তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত— এখন যাওয়া দূরের কথা, যেখানে যাচ্ছিল সেখানকার নামটুকু পর্যন্ত মনে নেই! শুধু তাই নয়, ফেলে-আসা দিনগুলির আর কোন কথাই তার মনে পড়ছে না।

চিন্তিত গলায় সুজয় প্রশ্ন করল, ভুলে যাওয়া কথা আর কি মনে পড়তে পারে না?

—পারে, আবার নাও পারে।

পৃথ্বীপাল বলল, কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই?

—আছে। কলকাতা বা বম্বের মত বড় শহরে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। লুপ্ত স্মৃতি কি ভাবে ফিরে আসতে পারে তার পন্থা বাতলাতে পারেন তাঁরা।

এর পর আলোচনা বাড়ানো নিরর্থক। আবার মত ছোট শহরের এই নার্সিং হোমে শেলার সুস্থতা সম্পর্কে আর কিছু যে করা যাবে না, তা সহজেই অনুমেয় শেলাকে নিয়ে দুজনে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্টেশনে পৌঁছে ওকে লেডিজ ওয়েটিং-রুমে বসিয়ে সুজয় প্ল্যাটফর্মে এসে সিগারেট ধরাল। পৃথ্বীপাল তখন এক ভাঁড় চা কিনেছে।

—চা খাবেন ব্যানার্জীবাবু?

—না। এদিকের বিষয়টা নিয়ে কি করা যায় সিংজী?

—তাই তো ভাবছি।

মাত্র কয়েক টান দেওয়া নিয়ে সিগারেটটা লাইনের উপর ফেলে দিল সুজয়! পাকা নেশা তবু এখন ধোঁয়া বিস্বাদ মনে হচ্ছে। কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিল সে রথীন মিত্রর সঙ্গে। এ কি বিড়ম্বনায় জড়িয়ে পড়ল।

বিরক্তির সুরেই সুজয় বলল, তখন মানবিকতার পরিচয় না দিতে গেলেই ভাল হত। কি রকম সমস্যার মুখোমুখি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি বলুন তো!

পৃথ্বীপাল চায়ের ভাঁড়ে শেষবারের মত চুমুক দিয়ে নিয়ে বলল, সমস্যা যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, মেয়েটির ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের অনুগ্রহর উপর নির্ভর করছে। একটা কিছু তো করতেই হবে।

মিনিট দশেক দুজনেই চুপচাপ রইল।

সুজয় বলল, ওর আত্মীয়-পরিজনরা হয়তো ওকে পাগলের মত খুঁজছে।

—স্বাভাবিক।

সুজয় হঠাৎ যেন বিবেকের ধাক্কায় সচেতন হয়ে উঠল, সত্যিই তো আমাদের কিছু করতে হবে! ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসা চাই। কলকাতার কোন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সিংজী, আচম্বিতে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায় মানুষের জীবনে। এই ধরনের কত কাহিনী তো লিখেছি। কোন দিন ভেবেছিলাম কি, কাহিনীর মতই এক বিশেষ আবর্তে আমি এইভাবে জড়িয়ে পড়ব।

—হয় এরকম। দেখুন না, আমি তো আপনার সঙ্গে ডুমরাও-এ আসিনি। অথচ কেমন গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে গেলাম। আমি কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি!

—কি বলুন তো?

—আপাতত মেয়েটি থাকবে কোথায়? এই মুহূর্তে নিশ্চয় আপনি কলকাতার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারছেন না! মেয়েটির থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

এ বিষয়ে একেবারেই ভেবে দেখেনি সুজয়। অথচ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথ্বীপালের কথায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। পুরুষমানুষ হলে কোন অসুবিধা হত না। স্বচ্ছন্দে

তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হতে পারত। কিন্তু নারী-শূন্য তার আবাসে শেলা কি করে থাকবে?

চিন্তিত গলায় সুজয় বলল, তাইতো! আমার বাড়িতে কোন মহিলা থাকলে অসুবিধা হত না, কিন্তু—কি আশ্চর্য, সমাধান তো রয়েছে। আপনিই তো পারেন এ সমস্যার সমাধান করতে।

—আমি!

—শেলাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন না কয়েক দিন। আপনার স্ত্রী, মা সকলেই রয়েছেন, তাছাড়া আপনার স্বজাতীয়াও বটে—

পৃথ্বীপাল একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমার বাড়িতে বলছেন? সে ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে।

—যাক, বাঁচা গেল। ওই কথাই রইল তাহলে!

পকেট থেকে গোটা কয়েক নোট বের করে সুজয় বলল, ট্রেন আসবার সময় বোধহয় হয়ে এল। আপনি তিনটে টিকিট কেটে নিয়ে আসুন।

টাকা নিয়ে টিকিট-ঘরের দিকে চলে গেল পৃথ্বীপাল।

সুজয় ওয়েটিং-রুমে এল। আর কোন মহিলা ছিলেন না সেখানে। শেলা ম্রিয়মান মুখে বসেছিল জানালার দিকে তাকিয়ে। জুতোর শব্দে মুখ ফেরাল। সুজয়ের মনে হল ওর দুচোখে বিষাদ জমাট বেঁধে রয়েছে।

সুজয় কিছু বলবার আগেই শেলা বলল, আমি এ সমস্তর কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনারা কি আমার আত্মীয়?

—না। নার্সিং হোমে যা জানিয়েছিলাম সেকথা মিথ্যে। আমরা আপনার কেউ নই। ট্রেন-দুর্ঘটনায় আহত আপনাকে আমরা তুলে এনেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন—

—আমি জানি তিনি কি বলেছেন। এতক্ষণ বসে বসে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম নিজের অতীতকে মনে করবার। কিছু মনে পড়ল না। আমি কোথায় যাচ্ছিলাম, কেন যাচ্ছিলাম, কে

আমি—?

—আপনি কলকাতা থেকে বোধহয় পাঞ্জাবের কোন শহরে যাচ্ছিলেন।।

—তাই হয়তো। সঙ্গে নিশ্চয় আমার আত্মীয়-স্বজন ছিলেন?

—নিশ্চয় ছিলেন।

—তাঁরা হয়তো সকলেই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। শুধু আমি—আমি বেঁচে রইলাম এই ভাবে।

—আপনি উতলা হবেন না। নষ্ট স্মৃতি ফিরে আসে এমন নজীর আছে। আপনারও আবার মনে পড়বে। সুস্থ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন।

—কিন্তু তার আগে—

—আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। নির্ভরও করতে হবে।

শেলা পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সুজয়ের দিকে। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলল, যদি আমি ভাল না হই?

মৃদু হেসে সুজয় বলল, পৃথিবীতে মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। এখুনি আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। ও-কথা এখন থাক। আমি বারবিঘা নামে একটা জায়গায় থাকি। ওখানে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য আপনি থাকবেন আমার সঙ্গী পৃথ্বীপালের বাড়িতে।

—তাঁর বাড়ীতে কেন?

—ওখানে আপনার সুবিধা হবে। আমি একা থাকি—পৃথ্বীপাল সপরিবারে থাকে। তাছাড়া সে আপনার স্বজাতি।

সুজয়কে বিস্মিত করে শেলা বলল, আমি ওখানে থাকব না।

—থাকবেন না!

—না।

—কেন বলুন তো?

—আপনার সঙ্গীকে আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

অজস্র মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেনি সুজয়। তবে যে

ক'জনকে দেখেছে তার মধ্যে এরকম সপ্রতিভ একটিও চোখে পড়েনি।

—পৃথ্বীপালের চেহারা দৈত্যের মত হলেও, মানুষ হিসেবে সে অত্যন্ত ভাল। তাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি।

—তা হোক।

—কিন্তু···আমি যে অবিবাহিত। একলা থাকি।

—আপনি নিশ্চয় আমার সম্মানের হানি ঘটাবেন না ?

এর পর আর কথা চলে না।

ওয়েটিং-রুম থেকে মন্হর পায়ে বেরিয়ে এল সুজয়। টিকিট কাটিয়ে ফিরছিল পৃথ্বীপাল। মুখোমুখি দেখা হল দুজনের। তিনটে টিকিট এবং বাকী পয়সা সুজয়ের হাতে দিতে দিতে পৃথ্বীপাল বলল, মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়ি আসছে।

—এদিকে আরেক ঝামেলা হয়েছে সিংজী।

—কি হল আবার ?

—শেলা আপনাদের বাড়ীতে যেতে চাইছে না। আমি বেশ বিব্রত বোধ করছি। লোকে কি বলবে তা অবশ্য গ্রাহ্য করি না।—তবে—

—তবে বলে চুপ করে গেলেন কেন ? বিব্রত ভাবকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। একটা ঝি রেখে নেবেন, তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না।

সুজয় কিছু বলল না।

ট্রেন এসে পড়ল। তিন জনে উঠে পড়ল প্রায়-খালি একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। পাটনা পর্যন্ত এক রকম চুপচাপই রইল তিনজন।

শেলা বারবিঘায় আসার পর ঘণ্টা আস্টেক কেটে গেছে।

নিজের শোবার ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়েছে সুজয়। আনুসঙ্গিক বাদ দিয়ে বড় ঘর বাড়িতে আছে মাত্র চারখানা—শোবার ঘর ছাড়া আর তিনখানা হল, ড্রইং রুম, স্টাডি ও লাইব্রেরী। সকালে ও

দুপুরে স্টাডিতে বসেই লেখে সুজয়। শুধু রাত্রে লেখার কাজটা করে শোবার ঘরে।

বাড়িতে পা দেবার পর থেকে একটি কথাও বলেনি শেলা। কেমন উন্মনা। তার সুন্দর কপালে চিন্তার অজস্র ভাঁজ। নিজের অতীতকে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে বোধহয়। সুজয়ও কোন কথা বলবার চেষ্টা করেনি তার সঙ্গে। তাকে একান্তে চিন্তা করবার সুযোগ দেওয়াই হল এখন বুদ্ধিমানের কাজ। যদি নিজেকে খুঁজে পায়। যদি মনে পড়ে যায় ভুলে-যাওয়া সমস্ত কথা।

নীরবেই আহার-পর্ব শেষ হল।

এবার ঘুমের বাড়ি পাড়ি দেওয়ার পালা।

স্টাডিতে প্রবেশ করে সুজয় বলল, মাঝের দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

শেলা কোন কথা বলল না। দরজা বন্ধ করে দিল। এবার আরেক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল সুজয়কে। সে একা মানুষ। কাজেই বাড়িতে এক-সেট বিছানা ও একটাই খাট আছে। যা এখন ব্যবহার করবে শেলা। অথচ রাত কাটাতে গেলে খাট না হলেও চলবে—কিন্তু বিছানা তো চাই। আগে এ-কথা একেবারেই মনে স্থান পায়নি।

স্টাডিতে আসবাবের মধ্যে ছিল ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, দেওয়াল-জোড়া বুক-কেস ও বেতের সোফা। আসবাবের মধ্যে পরিগণিত না হলেও আরেকটা জিনিস ঘরে আছে—দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আয়রন্ চেস্ট। জার্মান সেফ। নিলামে কলকাতায় কিনেছিল। এখানে কোন ব্যাঙ্ক না-থাকায় ও আরো বহুবিধ কারণে নিজের সমস্ত টাকা ও মায়ের গহনা আয়রন্ চেস্টে রাখে সুজয়।

বেতের সোফাটাকে রাতের অবলম্বন না করে উপায় নেই। ভরসার কথা, শুধু বেত নয়, বেতের উপর কুশন আছে। ড্রেসিং গাউন খুলে রেখে সিগারেট ধরাল সুজয়। জানলার সামনে এসে

দাঁড়াল। এগারোটা বাজছে। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে বারবিঘা। শুধু চতুর্দিকের নিস্তব্ধতাকে বার বার ভেঙে চলেছে ফ্যাক্টরির একটানা যান্ত্রিক শব্দ।

নাইট সিফ্টে কাজ হচ্ছে।

কয়েক টান দিয়ে জানালা গলিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল সুজয়। শ্লথ পায়ে এগিয়ে এসে নিজের ক্লান্ত দেহ ঢেলে দিল শোফায়। সে লম্বা মানুষ। তার পা সোফার হাতল ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেল। এ সমস্ত ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা সুজয়ের এখন নেই। শেলার প্রতি যে তার তীব্র সহানুভূতি নেই, তা নয়, তবে কেমন এক অসহ্য অসোয়াস্তি তাকে উতলা করে রেখেছে এখনও।

কালই দেবনাথকে চিঠি লিখবে।

তার পরিচিত দেবনাথ ঘোষ মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছে। সে তাকে সহজেই বলতে পারবে কোন্ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করলে এই ব্যাপারে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্ধকারের মধ্যে চোখ চেয়ে সুজয় শুয়ে রইল। আর ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগল চিন্তার অতলান্ত সমুদ্রে।

প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত চিন্তা সুজয়কে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। তারপর ঘুম এলেও, অভ্যাসমত ঘুম ভাঙল ভোরেই। মুখ-হাত ধুয়ে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিয়ে, কয়েক চুমুকে কাপ শেষ করে লিখতে বসে। আজ কিন্তু লেখায় মন বসল না। খাতার পাতায় কলম দিয়ে অর্থহীন গোটাকতক আঁচড় কেটে সুজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

শেলার বোধহয় ঘুম এখনও ভাঙেনি।

ঘরের অন্য পাশের দরজা খুলে সুজয় বারান্দায় এল। বারান্দায় পা দিয়েই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, রেলিংয়ের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেলা। ওর দৃষ্টি পাহাড়ের দিকে প্রসারিত।

ভোরের হাওয়ায় ওর রুক্ষ চুল উড়ছে। আনমনে এখনও কি ভাবছে কে জানে।

সুজয় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

চমকে মুখ ফেরাল শেলা।

—কখন ঘুম ভাঙল?

—অনেকক্ষণ।

—পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলেন?

ম্লান হেসে শেলা বলল, কিছুই দেখিনি। ভাবছিলাম নিজের কথা। অনেক ভেবেও কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।

নরম সুরে সুজয় বলল, হঠাৎ একদিন সমস্ত মনে পড়ে যাবে দেখবেন।

—আপনি বলছেন?

—হ্যাঁ। আমি আশাবাদী। আসুন আমরা ড্রইংরুমে যাই।

সুজয় রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল ত্রিলোককে চা-জলখাবার নিয়ে আসতে। তারপর ড্রইংরুমের দিকে এগুলো। শেলা অনুসরণ করল তাকে। ত্রিলোক সুজয়ের কম্‌বাইন্ড হ্যান্ড। মতিলাল ওকে সংগ্রহ করে দিয়েছিল। বেশ চটপটে ছোকরা। বিশ্বাসীও।

বেলা তিনটের সময় দেবনাথকে চিঠি লেখা শেষ করে নিজের হাতে ডাকে দিয়ে এল সুজয়। অনেক আগেই চিঠি লেখা শেষ করতে পারত। পৃথ্বীপাল এসে পড়ায় সম্ভব হয়নি। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়েছে। শেলার সম্পর্কেই ওঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল অবশ্য। বিদায় নেবার সময় পৃথ্বীপাল বলে গেছে, ব্যবসার কাজে ওকে বাইরে যেতে হচ্ছে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে নিশ্চয়।

চিঠি ডাকে দিয়ে ফিরে আসার পর সুজয় স্টাডিতে এসে রিভলভিং চেয়ারে বসল। শেলা পাশের ঘরে আছে। হয়তো

ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা অর্ধ-সমাপ্ত গল্পে সে মন বসাবার চেষ্টা করল। কিন্তু একবর্ণ লিখতে পারল না। গল্পের ছক যে তার মন থেকে মুছে গেছে এমন নয়। পরিষ্কার মনে আছে। তবু লিখতে পারল না।

নিজের উপর বিরক্তি ধরে গেল সুজয়ের। তার এ কি হল! লেখার উপর এমন অনাসক্ত ভাব তো তার আগে কখনো আসেনি। তবে? চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল প্রায় মিনিট কুড়ি। শেষে চার দেওযালের মধ্যেকার চাপা হাওয়ায় তার দম আটকে আসছে মনে হল। সুজয় তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে এল।

বাগান পেরিয়ে চলে এল রাস্তায়।

উদ্দেশ্যহীন ভাবেই এগিয়ে চলল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর চটকা ভাঙল সুজয়ের এ সমস্ত কি পাগলের মত করছে সে? শেলার উপস্থিতিতে তার মনে এইভাবে ঝড় উঠবে কেন? ভাগ্যের পরিহাসে নিদারুণ ভাবে তাড়িত মেয়েটিকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করলেই তো হয়।

সুজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। বাজারের কাছ বরাবর চলে এসেছে একেবারে। ধোঁয়ার রিং রচনা করতে করতে তাকাল এধার-ওধার, যদি কোন পরিচিত লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। হঠাৎ গুমগুম শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সুজয়। চমকে চোখ তুলল উপরের দিকে। পুরু জলভরা মেঘে আকাশ ভরে গেছে।

বৃষ্টি নামল বলে।

সুজয় দ্রুত পা চালাল বাড়ির দিকে। এ সময় বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না, নির্ঘাত নিউমোনিয়া। কয়েক পা এগিয়ে একটা রিক্সা পাওয়ায় সুজয় চড়ে বসল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একটা কথা মনে হওয়ায় সে রিক্সাচালককে মুখ ঘুরিয়ে বাজারের দিকে যেতে বলল।

শেলার কিছু জামা-কাপড়ের প্রয়োজন। একই শালোয়ার-পাঞ্জাবী পরে কত দিন থাকবে? এ বিষয় আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। তাছাড়া শীত এসে পড়ছে, এক্ষেত্রে—। যাহোক, শেষ পর্যন্ত যে মনে পড়েছে এই যথেষ্ট। একটা অল পারপাস গারমেন্টের দোকানের সামনে নামল সুজয়।

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে ইতস্তত করল। নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা ব্যক্ত করতে কেমন সঙ্কোচ হতে লাগল। কোন মহিলার জন্য জামা-কাপড় বা প্রসাধন দ্রব্য আজ পর্যন্ত সে কেনেনি। অবশ্য কেনবার মত কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি।

কাউন্টারে একজন ছোকরা গোছের লোক ছিল।

সে সবিনয়ে প্রশ্ন করল, আপনার কি চাই বলুন?

—আমার····

—পলেস্টারের বুস শার্ট নতুন এসেছে, নেবেন কি?

—না। মহিলারা ব্যবহার করতে পারেন এমন কিছু জামা-কাপড় আমি কিনতে চাই। আছে নাকি?

তারপর সুজয়কে আর কিছু ভাবতে হল না। অনেকগুলি সুদৃশ্য বাক্স এসে পড়ল কাউন্টারের উপর। নিজের ধারণানুসারে গোটা কয়েক বেছে নিয়ে প্যাক করতে বলল সুজয়। মিনিট কয়েকের মধ্যে প্যাকেট ও বিল দিল ছোকরা। অষ্টআশী টাকা হয়েছে। এতক্ষণ সুজয়ের খেয়াল হল তার পকেটে টাকা পাঁচেকের বেশী নেই। সে কাপড় কেনবার জন্য মোটেই প্রস্তুত হয়ে বেরোয়নি বাড়ি থেকে।

সুজয় লজ্জায় পড়ে গেল।

—দেখুন, এত টাকা আমার কাছে এখন নেই। প্যাকেটটা রাখুন। আমি বাড়ি ফিরে চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

দোকানের মালিক আরেক পাশে দাঁড়িয়ে একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি বিলক্ষণ চিনতেন

সুজয়কে। তাছাড়া এই ছোট জায়গায় তাকে কে না চেনে।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এত ঝামেলা করবার কি দরকার? আপনি মাল নিয়ে যান। সুবিধামত টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সুজয় জামা-কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। এ-রকম অবস্থার মুখে জীবনে সে কোনদিন পড়েনি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষমান রিক্সায় চেপে বাড়ি ফিরে চলল। শেলার সঙ্গে দেখা হল বাগানের লাগোয়া বারান্দাতে। ও বেতের চেয়ারে বসে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

পায়ের শব্দে শেলা মুখ ফেরাল।

সুজয় হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমার হাতের প্যাকেটে কি আছে বলুন তো?

শেলার উদাস দৃষ্টি বিস্ময়ে পরিবর্তিত হল। ও কিছুই বলল না।

—আপনার জন্যে জামাকাপড় নিয়ে এসেছি।

—কেন?

—ব্যবহার করবেন বলে।

—আমার তো রয়েছে। আবার···

—কোথায় আর আপনার আছে? একই শালোয়ার-পাঞ্জাবী পরে দিনের পর দিন কি কাটানো যায়?

সুজয় প্যাকেটটা বেতের টেবিলের উপর রেখে, ফিতে খুলে বার করল কাপড়গুলো।

—এখানে শালোয়ার কিন্তু পাওয়া গেল না।

শাড়ী ও ব্লাউজগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে শেলা বলল, কি দরকার ছিল এত কেনবার?

—পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন?

বৃষ্টিতে ভিজে সারাটা দুপুর এই সমস্ত করছিলেন বুঝি?

সুজয় হাসল—বৃষ্টিতে ভিজিনি তো।

শেলা আর কিছু বলল না।

দুজনেই চুপচাপ অনেকক্ষণ। ত্রিলোক চা ও কফি দিয়ে গেল। সুজয় চা খায় না। সে ত্রিলোককে বলে রেখেছে আজ রাত্রি থেকে তার মা যেন শেলার কাছে এসে থাকে। দুজনে নীরবে পেয়ালা শেষ করল।

সুজয় বলল, আপনার মনে পড়ে আগে আপনি চা খেয়েছিলেন কিনা?

—না। ওই সমস্তই তো মনে করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না।

—কলকাতা নামে কোন শহরের নাম শুনেছেন?

—কলকাতা! কোথায়?

—আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শহর। আপনি প্রথমে নিজের নামটা মনে করবার চেষ্টা করুন। তাহলেই ধীরে ধীরে সমস্ত মনে পড়ে যাবে।

—সেই চেষ্টাই তো করছি। আপনারা আমার কি যেন নাম রেখেছেন?

—শেলা।

—এর মানে কি?

—জানি না। পৃথ্বীপাল হয়তো জানে। কোন গুরুমুখী শব্দ হবে।

শেলা আর কোন প্রশ্ন করল না।

সুজয় সিগারেট ধরাল।

দুজনেই আবার নীরব কিছুক্ষণ।

শেষে সুজয় নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আপনার মনে এ প্রশ্ন একবারও জাগেনি, আমি কি করি? অর্থাৎ আমার পেশা কি?

—মনে হয়েছে। ভেবেছিলাম প্রশ্ন করব। কিন্তু—

—বলতে চাইছেন বোধহয়, সংকোচের জন্যে করতে পারেন নি। আসলে তা নয়। আপনি নিজেকে নিয়ে এত বিভ্রান্ত যে অন্যকিছু

চিন্তা করবার অবকাশ পাচ্ছেন না।

মনে হল শেলা যেন লজ্জা পেয়েছে।

সুজয় বলল, আমার পেশা হল গল্প লেখা।

—গল্প! চোখ বড় বড় করে শেলা বলল, কিসের গল্প লেখেন?

—কোন বিশেষ বিষয়-বস্তু নেই। নানা বিষয় নিয়ে লিখি?

—আমার মত—আমার মত কোন স্মৃতিভ্রংশ মেয়ের গল্প লিখেছেন?

—না। তবে একটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে লিখেছিলাম। সে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিল। তারপর ভুলে গিয়েছিল নিজের অতীতকে।

—এবার লিখতে পারবেন। আমি সহজেই আপনার একটি গল্পের নায়িকা হতে পারব।

সুজয় শেলার মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখে বিদ্রুপের কোন ইশারা নেই। শান্ত ভাব ছড়িয়ে রয়েছে। সুজয় উঠে দাঁড়াল। ঠেলে আশা দীর্ঘনিশ্বাসকে কোনরকমে চেপে শীর্ণ গলায় বলল, ওই দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমায় দেখবেন না, ও-কথা ভাবিনি।

সে ছায়াচ্ছন্ন মনে স্থানত্যাগ করল।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময় রাত্রের আহার শেষ করল দুজনে। কোন কথা হল না। শেলা নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিয়েছে। বিকেলে ওই কথা বলে সুজয়ের মনে আঘাত দিয়েছে বোধহয় বুঝতে পেরেছে। শেলার ভাব দেখে সুজয়ও কিছু বলতে সংকোচ বোধ করল।

ত্রিলোকের মা এসেছে। সে মাটিতে বিছানা পেতে শোবে শেলার ঘরে। সুজয় স্টাডিতে চলে এল। মাঝের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্টাডিতে প্রবেশ করেই তাড়াতাড়ি সুজয় জানলা বন্ধ করে দিল। বাইরে ঝড় ও জলের মাতামাতি চলেছে। বিকেলের সেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি কিছুক্ষণ আগে প্রবল আকার নিয়েছে। ঘরের

বেশ কিছুটা জায়গা ভিজে উঠেছে বৃষ্টির ছাঁটে। শীতশীত করছে।

এই মাসের শেষেই শীত পড়ে যাবে মনে হয়। এই ঝড় ও জল ঠাণ্ডার সূত্রপাত করল—প্রতি বছরই এই রকম হয় সুজয় লক্ষ্য করেছে। সঙ্গে করে একটা চাদর নিয়ে এসেছিল। আজ চাদর গায়ে দিয়ে না-শুয়ে উপায় নেই। বড় আলোটা নিভিয়ে বেডরুম ল্যাম্প জ্বালল সুজয়। হাল্কা লাল আলো ঘরখানাকে গ্রাস করল। স্পষ্ট আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরের আসবাব-পত্রগুলিকে মনে হচ্ছে যেন ছায়ায় গড়া। সুজয় শুয়ে পড়ল।

কালকের মত আজও কতক্ষণ দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না কে জানে? কিন্তু শুয়ে পড়েই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল সুজয়, দুচোখে ঘুম ভরে এল। গায়ে চাদর টেনে নেবার মিনিট দশেকের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না। ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়ার দরুন ঘুম ভেঙে গেল। গা থেকে চাদর খসে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে চাদরটা মাটি থেকে তুলে নিতে গিয়ে সুজয় থামল। তার দৃষ্টি গিয়ে আটকাল মধ্যবর্তী দরজায়। দরজা খোলা। শেলা এসে দাঁড়িয়েছে।

ধীর পায়ে শেলা এগিয়ে এল। বেডরুম ল্যাম্পের হাল্কা লালচে আভায় ওকে অপরূপ দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে চাদরটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার গায়ে দিয়ে দিল। ও বুঝতে পারেনি সুজয় জেগে রয়েছে। তারপর নিঃশব্দ গতিতে বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সুজয়।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিতে দিতে ওকে অনুসরণ করল। বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল শেলা। ঝড়ের মাতামাতি আর নেই। অবিশ্রান্ত ধারার বৃষ্টি পড়ছে। ঢালু জায়গা নইলে এতক্ষণে এক হাঁটু জল জমে যেত চারিধারে।

বৃষ্টির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে শেলা।

সুজয় পাশে এসে দাঁড়াল। শেলা চমকে মুখ ফেরাল।

—আপনি ঘুমোন নি ?

—ঘুম ভেঙে গেছে। আপনি—

—আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

—এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিলেন ?

একটু চুপ করে থেকে শেলা বলল, আপনার কথা।

—আমার কথা !

—আমার জন্য আপনার কত অসুবিধা হচ্ছে সেই কথাই ভাবছিলাম।

সুজয় মৃদু হেসে বলল, এই সমস্ত বাজে কথা ভেবে অনর্থক সময় নষ্ট করছিলেন ? আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

—আপনি বললে সে কথা আমি মানবো কেন ? আর সব কিছু বাদ দিলেও, ওই ভাবে বেতের সোফায় শুয়ে রাত কাটানো যে কত অসুবিধার তা কি আমি বুঝি না ?

হাসবার চেষ্টা করল সুজয়।

—আপনি অনর্থক চিন্তা করে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছেন। বেতের সোফায় বেশ আরামেই আমার রাত কেটে যায়।

শেলা ও প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না।

কয়েক মিনিট দুজনে চুপচাপ।

শুধু বিরামহীন ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে মিশমিশে কালো অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে চতুর্দিক। বোধহয় তারা দুজন ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। সুপ্তির অতলে মগ্ন হয়ে রয়েছে বারবিঘা।

সুজয় ড্রেসিং গাউনের পকেট হাতড়াল সিগারেটের জন্যে। শেলা একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করল সে।

—আমরা ছাড়া আর বোধহয় কেউ জেগে নেই।

—বোধহয়।

—আমরা জেগে রয়েছি কেন ?

সুজয়ের প্রশ্ন শুনে মুখ ফেরাল শেলা। পূর্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল বোধহয়। অন্ধকারের দরুন বুঝতে পারা গেল না।

—তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আমার একটা কথা রাখবেন ?

—বলুন।

—আমাকে—আমাকে কোন অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিন।

সুজয় এ-ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি। সে সবিস্ময়ে বলল, অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেব !

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—আমার বোঝা কেন বয়ে বেড়াবেন আপনি ?

—বোঝা…মানে…

—আপনি আশা দিলেও আমি জানি আমার ভাল হবার কোন আশা নেই। তবে কেন আমার মত স্মৃতিভ্রংশ মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে আতান্তরের মধ্যে রাখবেন ?

ওদের দুজনকে চমকে দিয়েই বারান্দার ঘড়িতে তিনটে বাজল।

সুজয় বলল, আমি স্বীকার করছি অনেক দায়িত্ব নিয়ে আজ পর্যন্ত কিছু করিনি। তবে কখনো কিছু করতে পারব না এমন নয়। আপনাকে বোঝা আমি মনে করিনি। মনুষত্বের দাবিতে আপনার বিপদে সাহায্য করতে আমি অগ্রসর হয়েছি। মন থেকে ও সমস্ত কথা ঝেড়ে ফেলে দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি একদিন নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন। যাক, আর কথা নয়। রাত শেষ হ'তে চলেছে। এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

মনে হল শেলা কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

ধীর পায়ে চলে গেল নিজের ঘরে। সুজয়ও স্টাডিতে ফিরে সোফায় আশ্রয় নিল।

একটু বেশী বেলায় ঘুম ভাঙল সুজয়ের।

রাত্রে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা নয়। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তার জাল বুনেছিল। স্বাভাবিক ভাবে ঘুম ভাঙতে তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। সে সোফা ছেড়ে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দেখা করল না শেলার সঙ্গে, গেল না পাশের ঘরে। ত্রিলোকের দিয়ে-যাওয়া জলখাবার শেষ করে লিখতে বসল।

জোর করে মন বসাল কাগজের পাতায়।

পরীক্ষা কাছে অথচ পাঠবিমুখ ছাত্র অভিভাবকের তাড়নায় যেমন জোর করে নিজেকে পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি সুজয় নিজেকে শাসন করেই খাতায় পাতায় মন দেবার চেষ্টা করল। লেখা ভাল হবে না বুঝতে পেরেও, চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অসমাপ্ত গল্পটা লিখে চলল।

ঘণ্টা দুয়েক লিখল প্রায়।

অনেক হয়েছে। আর নয়। টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে আড়মোড়া ভাঙল। এই সময় সুজয়ের মনে পড়ল, কাল কাপড়ের দোকানে টাকা পাঠানো হয়নি। টাকাটা দিয়ে আসা দরকার। ম্যাণ্টল্‌পিসের উপর একটা সুদৃশ্য পেতলের বাক্স আছে। বাক্সর মধ্যে থেকে চাবি বার করে আয়রন্ সেফ খুলে সুজয় টাকা বার করল। চাবি যথাস্থানে রেখে দিয়ে পাশের ঘরে এসে দেখল শেলা সেখানে নেই। স্টাডির দরজায় তালা লাগিয়ে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামল সুজয়।

রিক্সায় চেপে কাপড়ের দোকানে পেঁৗছে টাকা মিটিয়ে দিতে মিনিট পনেরোর বেশী লাগল না। সুজয়ের ল্যাণ্ডরোভার আছে। শিকারের সুবিধার জন্যে গাড়ীখানা কিনেছিল একজনের কাছ থেকে। ছোটখাট প্রয়োজনে গাড়ীটা বার করেনা, গ্যারেজে থাকে। শীতকাল আসছে ঘন ঘন তখন গাড়ীর প্রয়োজন হবে। বন্দুক বা রাইফেল সঙ্গে নিয়ে যাবে এখানে ওখানে।

ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল রথীন মিত্রর সঙ্গে। তিনিও বাজারে গিয়েছিলেন। হাতে কিসের একটা প্যাকেট। সুজয়কে দেখে বিচিত্র হাসিতে মুখ ভাসিয়ে এগিয়ে এলেন।

—কেমন আছেন মশাই?

—ভালই। আপনার খবর বলুন?

—যথা পূর্বং—। খবর তো এখন আপনার কাছে।

সবিস্ময়ে সুজয় বলল, কি রকম?

—আকাশ থেকে পড়লেন যে! উপন্যাসে যে সমস্ত নায়ক সৃষ্টি করেন, এখন তো আপনি তাদেরই একজনের জীবন্ত রূপ।

—পরিস্কার ভাবে আপনি তো কিছুই বলছেন না।

গলাকে বিশেষ এক খাদে নামিয়ে মিত্র বললেন, শুনলাম সেই মেয়েটিকে নাকি নিজের বাড়ীতে এনে তুলেছেন।

—হ্যাঁ।···মানে···আর তো কোন উপায় ছিল না।

—ওকথা বলবেন না। হাজারটা উপায় ছিল। একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, কাজটা আপনি ভাল করেন নি।

—আমার কিন্তু মনে হয়েছে, এক্ষেত্রে যা করণীয় আমি তাই করেছি।

—দুনিয়াকে পরিস্কার চোখে এখনও দেখতে শেখেন নি। অপরাধ আপনার নয়, অপরাধ হল বয়সের। আমার স্ত্রীও ওই কথা বলছিলেন, আপনার মত মানুষরা এই ভাবেই কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ে।

সুজয়ের দ্রূ কুঁচকে উঠল।

—কেলেঙ্কারী! আপনি কি বলতে চাইছেন?

মুখে একবার রুমাল বুলিয়ে রথীন মিত্র বললেন, আমি আপনার একজন ওয়েল উইসার না হলে কখনই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতাম না। চারিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে কি রকম জোর আলোচনা চলেছে জানেন না বোধ হয়?

—কেন যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এত আলোচনা

চলেছে বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আমি তো কারুর কোন ব্যাপারে থাকি না। তাছাড়া আমার অপরাধ কি? কি অন্যায় করেছি?

—আপনি কারুর ব্যাপারে না থাকতে পারেন। কিন্তু মুখরোচক আলোচনার বিষয় পেলে কে আলোচনা থেকে বিরত থাকবে বলুন? অজাতের এক সুন্দরী যুবতীকে বাড়ীতে এনে তুলেছেন, লোকে বলাবলি করবে না?

সুজয়ের উত্তেজনা উত্তর-উত্তর বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল নাক মুখ দিয়ে এবার গরম ভাপ বেরুতে আরম্ভ করবে। অবশ্য সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে রসাল আলোচনার বন্যা বইছে চতুর্দিকে!!!

—আপনারা দেখলেন যুবতী অজাতের এবং সুন্দরী। কিন্তু সে যে কত বড় বিপদে পড়েছে, স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলায় তার অনাগত জীবন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তা কেউ লক্ষ্য করলেন না! আমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছি, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মানবিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি, এই কি আমার অপরাধ?

স্থান কাল ভুলে একটু জোরেই হাসলেন রথীন মিত্র।

বললেন তারপর, ও সমস্ত কথা আজকাল যারা বলে তারা ভান করে মাত্র। আপনাকে আমি অপমান করছি একথা মনে করবেন না। শুনুন মিঃ ব্যানার্জী, আপনি সাহিত্যিক, ভাবপ্রবণ মানুষ বলেই বাস্তবের অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন না। তাই এই ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। ধরুন, তার যদি ভাল হবার কোন সম্ভাবনাই না থাকে, তখন—তখন তাকে নিয়ে কি করবেন ভেবে দেখেছেন?

অজস্র কথা সুজয়ের ঠোঁটের আগায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কিন্তু সে এই আলোচনার আর জের টানল না। শুধু রিক্সাচালককে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। রিক্সা এগিয়ে চলল। হতভম্ব রথীন মিত্র দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু।

অসহ্য উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে সুজয় নিজের বাড়ীর

সামনে রিক্সা থেকে নামল। তার সম্পর্কে এত কথা হচ্ছে চতুর্দিকে! তার অপরাধ হল, সে একটা ভাল কাজ করবার চেষ্টা করেছে— আশ্চর্য! এক নক্কার জনক চিন্তাধারাকে স্থানীয় কিছু মানুষ সযত্নে লালন করে চলেছে!

গেট পেরিয়ে সুজয় বাগানে প্রবেশ করল।

রথীন মিত্রর সঙ্গে এত দিনের চেনা জানা। অথচ বুঝতে পারেনি ভদ্র চেহারার আড়ালে সযত্নে নোংরা মনকে তিনি পুষে চলেছেন। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক নিজের পরিচিত জনদের এমন অনেক কিছু রসিয়ে রসিয়ে বলছেন যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্কই নেই।

কিন্তু একটা কথা—

সুজয় বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তাঁর একটা কথাকে হেলায় উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। নিশ্চিতভাবে তলিয়ে দেখার মত কথা। যদি শেলা নিজের স্মৃতি-শক্তি ফিরে না পায়, তাহলে কি হবে? শেষ পর্যন্ত ওকে কি কোন উদ্ধার আশ্রমে—কোন···না, না এখন মনের কোনেও ওকথা স্থান দেওয়া চলতে পারে না। তবে—

সমাধানের কূলে পৌঁছান এত সহজ নয় সুজয় জানে। মনের মধ্যেটা খচ খচ করতে থাকে। অথচ ওই বিশেষ প্রশ্নের সমুচিত উত্তর তাকে পেতেই হবে। সময় সময় জীবন যে এত বিড়ম্বনা জর্জরিত হতে পারে তা তার চিন্তার অতীত ছিল। সুজয় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর মধ্যে গেল।

শেলা তখন নিজের ঘরে ছিল না।

কোথায় গেল?

ওর সন্ধান পাওয়া গেল রান্নাঘরে। এখন পরণে শালওয়ার পাঞ্জাবী নেই সুজয়ের কিনে এনে দেওয়া শাড়ী পরেছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে অপরিষ্কার তাকটা পরিষ্কার করছিল। সত্যি কথা বলতে কি অপরূপ দেখাচ্ছে শেলাকে। আরেক আকর্ষণীয় রূপে

আজও সুজয়ের চোখে ধরা দিল।

দরজার কাছ থেকে সুজয় সরে যাচ্ছিল, শেলা তাকে দেখতে পেয়ে গেল। সরে যাওয়া আর হল না। শ্লথ পায়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

—কোথায় গিয়েছিলেন ?

—বাজারের দিকে গিয়েছিলাম।

—এই সাত সকালে না গেলে কি চলছিল না ?

শেলার গলায় সূক্ষ্ম অনুযোগের সুর।

—বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আপনি এখানে—

সুজয় লক্ষ্য করল তার প্রশ্নে শেলা লাল হয়ে উঠেছে।

কাঁপা গলায় বলল, বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। ভাবলাম ত্রিলোককে গিয়ে একটু সাহায্য করি।

—ত্রিলোক গেল কোথায় ?

—তরকারি আনতে বাজারে গেছে।

চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে সুজয় বলল, ঘরের তো ভোল পাল্টে দিয়েছেন। ত্রিলোক ফাঁকিবাজ নয়, তবে সে পুরুষ মানুষ। হাজার চেষ্টা করলেও আপনাদের মত পরিপাটি ভাবে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শেলা চুপ করে রইল।

সুজয় আবার বলল, শুনলে অবাক হবেন, আপনার আগে কোন মহিলা এই রান্না ঘরে প্রবেশ করে নি।

—কেন ?

—কে আসবে বলুন ?

—আপনার কেউ নেই ?

—কেউ না। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। তবে একটা বিরাট অবলম্বন আছে।

—কি ?

—টাকা—অনেক টাকা। শুনেছিলাম টাকা থাকলে নাকি সব

পাওয়া যায়। অথচ দুনিয়ার অধিকাংশ দরিদ্রও যা পেয়ে থাকে, আমার টাকা সত্ত্বেও তা পেলাম না। টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা গেলেও, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা কি কেনা যায়? আমার ছন্নছাড়া সংসারে কে এসে রান্নাঘর গুছিয়ে দেবে বলুন?

শেলা কাছে এগিয়ে গেল সুজয়ের।

—বিয়ে করেন নি কেন?

সুজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, বিয়ে আমি একজনকে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। সেই থেকে আমি আর ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এই নিঃসঙ্গতাকে আপ্রাণ ভাবে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছি।

শেলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। ত্রিলোক বাজারের থলি হাতে করে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। সে বোধহয় এই সময় মালিককে এখানে আশা করেনি। সুজয় মন্থর পায়ে ওখান থেকে চলে এল স্টাডিতে।

বেলা সাড়ে এগারটার সময় শেলা খাওয়ার কথা বলতে এল। ঠিক এই সময় পিয়ন এসে উপস্থিত। একজন প্রকাশক রয়লটির টাকা পাঠিয়েছেন। সই করে টাকাটা নিয়ে আবার স্টাডিতে এল সুজয়। টাকা চেস্টের মধ্যে রেখে, চাবি পেতলের বাক্সর মধ্যে রাখল যথানিয়মে।

শেলা ঘরেই ছিল।

বলল, আপনি এইভাবে টাকা রাখেন? চোর ঘরে ঢুকলে—

—সহজেই চেস্টের চাবির সন্ধান পাবে বলছেন? আসল ব্যাপারটা কি জানেন, এই ঘরে ঢোকার সাহস কারুর নেই। সুরক্ষিত বলে বলছি না। ওই কোনে দেখছেন—

শেলা দেখল রাইফেলটা কোনে দাঁড় করানো রয়েছে।

—এ অঞ্চলের সকলেই জানে আমার লক্ষ্য কত অব্যর্থ। আসুন, খেয়ে নেওয়া যাক।

নীরবেই আহার পর্ব শেষ হল।

সঞ্জয় ফিরে এল স্টাডিতে। লিখতে বসেই উঠে পড়ল। কিছুই ভাল লাগছে না। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে পায়চারী করল অনেকক্ষণ। মনের মধ্যে এক অজানা আকুলতা মোচড় দিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে সে যেন ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

একি হল তার!

জীবনে এত উঠা পড়া গেছে, কখনও তো এত অস্থিরতা বোধ করেনি। হঠাৎ মনে হল, দাড়ি কামাবার আয়না বার করে এখন একবার নিজের মুখ দেখে নেয়। চিন্তার প্রতিফলন কি মনের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে? শেষে কি ভেবে আর আয়নার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল না। কি হবে দেখে?

দাঁড়াল গিয়ে জানলার সামনে। মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই আকাশে। পড়ন্ত রোদ ছেয়ে রয়েছে চারিদিকে। হঠাৎ সঞ্জয়ের দৃষ্টি পড়ল জানলার অদূরের দেবদারু গাছটার উপর। তার একটা নুয়ে পড়া ডালে দুটো ঘুঘু বসে আছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের উপর। তারা ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে থেকে থেকে।

ঝটিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সঞ্জয়। অদ্ভুত এক খেয়ালের বশে দৌড়ে ঘরের আরেক প্রান্তে চলে গেল। রাইফেলটা লোড করে নিল মুহূর্তের মধ্যে। আবার ফিরে এল জানলার সামনে। দুহাত দিয়ে তুলল রাইফেল, তারপরই উপর্যুপরি গুলি করল দুবার।

গুলির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হবার পরই শেলা ছুটে এল এঘরে।

ওর চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন।

—কি হল?…একি আপনার হাতে বন্দুক কেন?

সঞ্জয় আবার রাইফেল যথাস্থানে গিয়ে রাখল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। উত্তেজনায় কাঁপছে শরীর।

—দুটো পাখী বসেছিল ওখানে। মেরে ফেললাম।

ছিন্নভিন্ন ঘুঘু দুটো ঘাসের উপর পড়েছিল। জানলা দিয়ে

সেই দৃশ্য দেখে নিয়ে চোখ বুজল শেলা।

—মেরে ফেললেন পাখী দুটোকে। কেন?

—জানি না। বিশ্বাস করুন, ও দুটোকে কেন মেরে ফেললাম জানি না।

শেলা তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আপনার কি শরীর খারাপ?

—না।

—কি হয়েছে তবে? আপনাকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখাচ্ছে।

—কি জানি কি হয়েছে।

—আমি কি আপনাকে অস্থির করে তুলেছি?

সুজয় দ্রুত গলায় বলল, না, না, ওকথা বলবেন না। আপনি জানেন না, আপনি আছেন বল কত—সে যাক, আমার একটা কথা রাখবেন?

—বলুন?

—চলুন না, কোথাও ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—পাহাড়ের ধারে ধারে বেশ কিছু দূরে। যাবেন?

শেলা চকিতে একবার সুজয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, চলুন—

সুজয় দ্রুত স্টাডির জানলা, দরজা বন্ধ করে, গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করল। তারপর রওয়ানা হল দুজনে বাড়ি থেকে। নানা ভাবনা ঘুর পাক খেতে থাকলেও, সুজয়ের মন এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। লোকালয় পার হতেই সে গাড়ীর গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। দুপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখ মেলে দেখবার আগেই মিলিয়ে যেতে লাগল। মুখের উপয় বারংবার ঝাপটা মেরে চলল ঠাণ্ডা হাওয়া।

হাওয়ার ঝাপটায় শেলার চোখ বুজে আসছিল।

—এত জোরে চালাচ্ছেন কেন?

—অসুবিধা হচ্ছে ?

শেলা মৃদু হেসে বলল, জোরে গাড়ী চালালে দুপাশের তো কিছুই দেখা যাবে না।

ঠিক বলেছেন। আমারই ভুল।

গতি কমিয়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, পাহাড়ের গা ঘেঁসে গাড়ী থামাল সুজয়। গহন বনভূমি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারা যায় না, লোকালয় খুব বেশী দূরে নয়। এগাছে ওগাছে বসে নাম না জানা পাখীরা একটানা ডেকে নির্জনতা ভঙ্গ করে চলেছে।

সূর্য আরো হেলে পড়েছে পশ্চিমে।

গাড়ী থেকে নেমে চারিধারে খুশী ভরা চোখে তাকিয়ে নিয়ে শেলা বলল, আমরা শহর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, না ?

—খুব দূরে নয়। মাইল দশেক।

—মাত্র। আমার তো মনে হচ্ছিল আরো অনেক বেশী।

—আপনার ভাল লাগছে জায়গাটা ?

—খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, ওটা কি পাখী ?

পাথরের চাঙড়ের উপর বসে একটা পাখী পোকা ঠুকরে খাচ্ছিল।

সুজয় ওকথার উত্তর না দিয়ে, অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, আপনার ভয় করছে ?

শেলার দুচোখে বিস্ময়।

—ভয় করবে কেন ?

—এই জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু আছে।

—দিনের আলোয় হিংস্র জন্তুরা আবার বেরোয় নাকি ?

—জন্তুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশী হিংস্র তা জানেন কি ? এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। কারুর আসবার সম্ভাবনাও কম। এই গভীর নিস্তব্ধতা আপনাকে উতলা করে তুলছে না ? ভয় করছে না আমাকে ?

শেলা একটু আশ্চর্য্য হল যেন।

হাসবার চেষ্টা করে বলল, ভয়? কই, নাতো!

—আপনি আমাকে ভাল করে চেনেন না। জানেন না তো আমি কি প্রকৃতির?

—এই কদিনেই আমি আপনাকে চিনেছি। আমি—

সুজয় আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। মনের প্রবল ইচ্ছে দুর্বার বেগে বেরিয়ে এল।

—তুমি—তুমি আমায় চিনেছো! তুমি কি তাহলে বুঝতে শেলা, আমার মনের ভাব? আমি নিজেকে চেপে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি। কিন্তু আর পারছি না। বিশ্বাস কর আমি তোমায় গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছি।

শেলার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

—অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন বাকী জীবন নিঃসঙ্গতার মধ্যেই কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হল না। তুমি আমার সেই মনোভাবকে তচনচ করে দিয়েছো। ঈশ্বরের এই বোধহয় অভিপ্রেত ছিল।

—কিন্তু—

—ভাবতেও ভাল লাগছে এবার আমার মনের ফাঁকা দিকটা ভরে উঠবে। তবে তোমার কাছে একটা কথা লুকোব না। আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, এখন পরিষ্কার করেই বলতে চাই। তখন আমার বয়স অল্প। একটি মেয়েকে ভাল লেগেছিল। বিয়ে করব যখন স্থির করে ফেলেছি তখন জানতে পারলাম তার অবৈধ জীবন যাপনের কথা। তা সত্ত্বেও আমি নিজের করে তাকে পেতে চেয়েছিলাম, কেন জানি না সে রাজী হল না। আমার মন বিষিয়ে উঠল। তারপর থেকে মেয়েদের সযত্নে আমি এড়িয়ে গেছি। এতদিন পরে তুমি এলে। সেই বিরূপতা ভেসে গেল কোথায়। এবার আমার জীবন পরিপূর্ণ হবে।

—না—না—এ হবার নয়—

—কেন নয়? আমার অতীত জীবনের প্রেম কি তোমার মনকে ধাক্কা দিচ্ছে?

—না।

—তবে—

শেলা কিছু বলতে পারল না।

সুজয় আবার বলল, মনস্তত্ত্বের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা। তুমি কি ভাব তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পারিনি?

শেলা মাথা নীচু করল। সুজয় আর ইতঃস্তত না করে, দুহাত দিয়ে ওকে নিজের কাছে টেনে নিল। বাধা দিল না শেলা। কয়েক মিনিট সুজয়ের বুকের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল ও। তারপর সরে এসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল নম্র গলায়, তুমি একটা জিনিস তলিয়ে দেখছ না, আমি হয়তো কারুর স্ত্রী, হয়তো কারুর মা—

—তোমার অতীত তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। তোমার জীবন বর্তমানকে নিয়ে। তুমি নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করবে এবার। ভুলে যাওয়া অতীতের কথা ভেবে কেন তুমি ভবিষ্যতকে নষ্ট করবে শেলা?

—যদি কোন দিন অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। তখন—তখন কি হবে আমার?

—তখন তোমার নতুন করে বাঁধা ঘরকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফিরে যেতে যদি মন চায়, তাই যেও। এখন অনিশ্চিত—অনাগত দিনের কথা ভেবে লাভ কি?

শেলা আর কিছু বলতে পারল না।

মাটির দিকে তাকিয়ে নীরবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নাম জানা ও অজানা পাখীরা তখনও ডেকে চলেছে। কিসের আশায় ওদের এই তারস্বরে ডাক কে জানে। দৃষ্টির বাইরে দিয়ে, শুকনো

পাতার মচ মচ শব্দ তুলে একটা জন্তু চলে গেল। বোধহয় শেয়াল।

বুভুক্ষুর মত শেলার দিকে তাকিয়ে আছে সুজয়।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। সময়ের হিসেব নেই।

—বাড়ী চল—

শেলার কথায় সুজয়ের চটকা ভাঙল। দুজনে গিয়ে বসল গাড়ীতে।

বাড়ীতে ফেরার পর সুজয়ের ইচ্ছে হল, নিজেদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করে। কিন্তু নিজের ইচ্ছা দমন করল সে। আজ ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। শেলা অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

মনের ভার এখন অনেক হাল্কা। গুরুভার বোঝা যেন নেমে গেছে। এখন কেমন লেখার তাগিদ অনুভব করছে। ষ্টাডিতে গিয়ে এই ভরা বিকেলেই সুজয় লিখতে বসল। অর্দ্ধ সমাপ্ত উপন্যাসটিকে কয়েকদিন চেষ্টা করে এক লাইনও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আশ্চর্য্যের বিষয় এখন কলম দ্রুত চলতে লাগল।

দিন দুয়েক কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে ভবিষ্যত জীবন নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে দুজনের মধ্যে। উপন্যাস ও দ্রুত তালে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এক সপ্তাহ পরেই শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়। তারপর শুধু পাণ্ডুলিপি নিয়ে নয়, শেলাকেও সঙ্গে নিয়ে কলকাতা যাবে। পৃথ্বীপাল এখন ফিরে এলেই হয়। তার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে।

মতিলালকে এত বড় ব্যাপারের কিছুই না জানানোর জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করছিল। শেলার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হবার পরই বিস্তারিত ভাবে সমস্ত কিছু জানিয়ে তাকে চিঠি লিখে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে মতিলালের টেলিগ্রাম

পেয়েছে। জানিয়েছে সে, আজই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

চা পর্ব শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

সামনের বারান্দায় বসে ছিল দুজনে। খাপছাড়া ভাবে কথা হচ্ছিল।

একসময় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সুজয় বলল, আমাদের দুজনকে ঘিরে চারি দিকে খুব আলোচনা হচ্ছে।

শেলা অবাক হয়ে বলল, কিসের আলোচনা ?

—বললাম না, আমাদের দুজনকে নিয়ে। এরকম মুখরোচক আলোচনা তো সব সময় মানুষ হাতের কাছে পায় না। পেয়ে যখন গেছে তখন টিকা সহযোগে মন্তব্য করতে বাধা কোথায় ? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, বাড়ীর বাইরে পা দিলেই কেউ না কেউ নানা উপদেশ বর্ষণ করছেন।

—কি হবে ?

—কি আবার হবে। বলা বলিতে কিছু আসে যায় নাকি ? তাছাড়া আমি তো সমস্ত কিছুর উপর পর্দা ফেলে দিতে চলেছি।

—তুমি বলতে চাইছো…

—বিয়ের কথা বলছি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মতিলাল বোধহয় এতক্ষণ এসেছে দুমকা থেকে! তার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। পৃথ্বীপালও আসুক। তারপরই বিয়ের দিন স্থির করে ফেলব।

শেলা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

—কি বলবে বল।

—আমরা এখান থেকে চলে গেলে হয় না ?

মৃদু হেসে সুজয় বলল, কয়েকদিনের মধ্যেই তো আমরা কলকাতা যাব। বিয়ে পর্বটা ওখানেই সেরে নেওয়া চলতে পারে। তারপর ধর মাসখানেকের জন্যে কাশ্মীর—

—আমি বলছিলাম, একেবারেই যদি আমরা এখানে না ফিরি।

—কেন বলতো ?

—আমার এ জায়গাটা ভাল লাগে না। কেমন ভয় ভয় করে। তাছাড়া তুমি একজন নামী লোক, এই ছোট জায়গাতেই বা পড়ে থাকবে কেন ?

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ বিষয়ে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করব।

—উঠলে যে—?

—মতিলালদের বাড়ীতে যাই। নটার মধ্যেই ফিরব। কাল সকালে ওকে এখানে আসতে বলব তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

সঞ্জয় চলে গেল।

ত্রিলোক এসে অনেকক্ষণ আগেকার খাওয়া চা এর কাপ প্লেট গুলো নিয়ে গেল। অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে শেলা বসে রইল আরো কয়েক মিনিট। মনের মধ্যে নানাচিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছে। একা থাকলেই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে।

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল শেলা।

একি !!!

নির্বিকার মুখে পৃথ্বীপাল বিছানার উপর বসে আছে।

—আপনি—?

—দেখতেই পাচ্ছ।

পৃথ্বীপাল এগিয়ে গিয়ে দরজায় অর্গল তুলে দিল।

—কেন এসেছেন এখানে ? চলে যান—দয়া করে এখান থেকে চলে যান। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—জানলা টপকে এসেছি। কেউ দেখেনি, দেখতে পাবেও না।

বন্ধ দরজার দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে শেলা বলল, আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

নির্বিকার ভঙ্গীতে পৃথ্বীপাল বলল, এই বিপদের ঝুঁকি আমি স্বেচ্ছায় নিইনি। তুমি আমাকে আসতে বাধ্য করেছো।

শেলা কিছু বলল না।

কি বলবার আছে ওর। ভয়ে নীল হয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চলেছে। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলার ইচ্ছে হলেও, পাচ্ছে না। অথচ অজানা ছিল না এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আজ নয় কাল ওকে দাঁড়াতে হবেই।

—শাড়ী পরে তো বেশ দেখাচ্ছে তোমায়। সুজয়বাবু কিনে দিল নাকি?

—হ্যাঁ।

—শেলা—

—বলুন?

—কাজের কতদূর কি হল?

—কাজের····

—অনেক সময় তোমাকে দিয়েছি। এতদিন কাজ সেরে তোমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়ল শেলা।

—একাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি···আমি····আমায় আপনি রেহাই দিন পৃথ্বীপালজী।

—রেহাই দেব! কেন হবে না শুনি?

—কেন বুঝতে পাচ্ছেন না, একজন নির্বিরোধ ভদ্রলোককে সর্বস্বান্ত করার মত মনের জোর আমার নেই।

—অথচ সেদিন তোমার দাদা উৎসাহের সঙ্গে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিল। তুমিও রাজী হয়েছিলে। এখন পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন? প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে জানবে। সময়

তোমাকে আর বেশী দিতে পারব না। আজই কাজ শেষ করতে হবে।

শেলার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। সমস্ত শরীর গুলিয়ে, উঠছে কেমন। এরকম আতান্তারে মানুষকে কেন পড়তে হয়?

—তখন রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। আপনার পাওনার তাগাদা আমাদের পাগল করে তুলেছিল।

—সে পাওনার তাগাদা কি এখন নেই? আবার তোমায় বলছি, আর সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ও ধরা গলায় বলল, পারব না। আমি বলছি পারব না। সুজয়বাবুর মত মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করাও পাপ।

—তাই নাকি? এই পাপ পুণ্যেবোধটা আগে ছিল কোথায়?

চিবিয়ে চিবিয়ে পৃথ্বীপাল বলল, মনে করেছো আমি কিছু বুঝতে পারিনি? শোন, শেলা, এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী দিন ধরে আছি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। প্রেমে পড়ে গেছো ছোঁড়াটার—দরদ একেবারে তাই উথলে উঠছে?

—চেঁচিয়ে কথা বলবেন না, চাকরটা শুনতে পাবে।

—আমি তোমার কাছে শেষ কথা শুনতে চাই।

—শেষ কথা?

—হ্যাঁ। পারবে কি পারবে না।

—বলছি তো, পারব না।

পৃথ্বীপাল কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

—আমার শেষ কথাটা শুনে রাখ। তোমার এই অবাধ্যতার ফলে কাল দুপুরের মধ্যেই তোমার দাদা নিরঞ্জন সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। কার্তার সিংকে মনে পড়ছে তো—নিরঞ্জনের সুন্দরী বৌ-এর জন্য সে পাগল হয়ে রয়েছে। তোমার বৌদিকে লোপাট করার এত বড় সুযোগ কার্তার ছাড়বে বলে মনে হয় না।

—এ সমস্ত কি বলছেন ?

—আমার বলা এখনও শেষ হয়নি। আর তুমি—? তুমি দুকুল হারাবে। ঘরে তোমাকে জায়গা দেবার মত কেউ থাকবে না। সুজয়ের কাছে তোমার স্বরূপ যাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে আমাকে করতে হবে। বুঝতেই পারছো, এখান থেকেও উৎখাত হবে তুমি। তখন তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা থাকবে, পেটের দায়ে কোন দালালের সাহায্যে কোঠায় গিয়ে ঘর নেওয়া—অথবা বাঁধা বাবু সংগ্রহ করা।

শেলা দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরল।

—না—না

—আমি তাহলে এখন চলি।

—পৃথ্বীশাল জানলার দিকে এগুলো।

দৌড়ে গিয়ে তার পথ রোধ করল শেলা।

—কথা দিচ্ছি আপনার টাকা যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করে দেব। শুধু আমায় একটা বছর সময় দিন।

—এরকম প্রতিজ্ঞা তোমরা অনেক বার করেছো, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারনি। এক বছর তো দূরের কথা, একদিন সময়ও আর আমি দেব না। ভেবে দেখ শেলা, কত কষ্টে নিরঞ্জন তোমাকে মানুষ করেছে। আজ চরম বিপদের দিনে তুমি তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করবার চেষ্টা করছো! এছাড়া তুমি নিজের বিপদের কথাও ভেবে দেখ।

—পৃথ্বীপালজী—

—একটা পরিবারকে নিজের খেয়াল খুশীতে ছিন্নভিন্ন করে দেবার কোন অধিকার বোধহয় তোমার নেই। সুজয় সর্বস্বান্ত হবে—এ ধারণা তোমার মনে কেন এল বুঝতে পাচ্ছি না। তার সিন্দুকের টাকা খোয়া গেলেও, সে লিখে এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা রোজগার করে নিতে পারবে।

শেলা কি বলবে ভেবে গেল না।

পৃথ্বীপাল ওর দিকে এগিয়ে এল। তার অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল এবার ওষুধ ধরেছে। তার ইচ্ছে মত কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে।

ফিস ফিস করে বলল, চাবিটা কি সব সময় নিজের কাছে রাখে?

—না।

—তবে?

পৃথ্বীপালের দাড়ি কণ্টকিত কদাকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে স্টাডির তালা বন্ধ দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে শেলা বলল, ওই ঘরে একটা পেতলের কৌট আছে। চাবি তার মধ্যেই থাকে। ওখান থেকে চাবি সংগ্রহ করা সহজ কথা নয়।

—রাত্রেও কি তালা দেওয়া থাকে ওই ঘরে?

—না। উনি ও ঘরে শোন। আমি এধার থেকে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করি!

পৃথ্বীপালের কুঁচকে যাওয়া ভ্রূ সরল হল।

—তাহলে তো খুব সহজেই কার্যোদ্ধার করতে পারবে। কোন গোলমাল, কোন ঝামেলার মধ্যেই তোমাকে পড়তে হবে না দেখছি।

একটু থেমে আবার বলল, এই বাড়ী তৈরী করার সময় আমিই সিন্দুকটা দেওয়ালের সঙ্গে বসিয়েছিলাম। আমার সামনেই তাড়াতাড়া নোট রেখে সিন্দুকের তালা বন্ধ করেছিল সুজয়। সেই দিন থেকে—বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকে ওই সিন্দুকের উপর আমার দৃষ্টি আছে। এতদিন পরে—ওকথা এখন থাক।

পৃথ্বীপাল পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে শেলার হাতে দিল।

—এই মোড়কটা রেখে দাও। এতে এক ধরনের ওষুধ আছে।

—ওষুধ কি হবে?

—আমি তৈরী হয়েই এসেছি। ওষুধ কি হবে বুঝতে পাচ্ছ না?

—না।

—কোন পানায়র সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই যে ঘুম আসবে তা ঘণ্টা ছয়েকের আগে ভাঙ্গবে না। এবার বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়, কত সহজে পেত্তলের বাক্সটার মধ্যে থেকে চাবিটা তুমি বার করে নিতে পারবে।

কথাটা শেষ করে শেলাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই পৃথ্বীপাল জানলা টপকে অদৃশ্য হল। দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে শেলা বিছানার উপর বসল। চিন্তার আকাশ এখন ওর মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে।

এ-রকম দুর্বিপাকেও মানুষকে পড়তে হয়। সুজয়ের জন্যে মন ব্যথায় টন টন করে উঠল। কিন্তু উপায় নেই, ঘৃণ্য কাজটা ওকে করতেই হবে। ওদের সমস্ত সুখ-শান্তি পৃথ্বীপালের হাতের মুঠোর মধ্যে। তার অবাধ্যতা করতে যাওয়ার পরিণাম ভয়ানক। অথচ চিরকাল এত আতান্তরের মধ্যে ওদের দিন কাটেনি। দেশ-বিভাগের পর লাহোর থেকে নিরঞ্জন সিং বিধবা মা ও পাঁচ বছরের বোন শেলমাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসেছিল। প্রথম ক'টা বছর ওদের দুর্দশার সীমা ছিল না। বাঁধন-ছেঁড়া নৌকার মত এখানে-ওখানে ভেসে বেরিয়েছে। তারপর ওরা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে ডুমরাঁওতে। নিরঞ্জন বিস্কুটের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ধিকিয়ে ধিকিয়ে দিন এগিয়ে চলল।

ষোলটা বছর কেটে গেছে এর পর। শেলমা পূর্ণযৌবনবতী হয়েছে। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে নিরঞ্জন। পদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে পৃথ্বীপালের। বলতে গেলে আলাপ হওয়ার পর থেকে ওদের দুর্ভাগ্যের সূচনা।

একদিন পৃথ্বীপাল এসে বলল নিরঞ্জনকে, বিস্কুট বেচে কি আর পয়সা পাও। পয়সা রোজগারের জন্যে আরো অনেক কিছু করতে হয়।

ভালমানুষ নিরঞ্জন উৎসুক ভাবে বলল, কি করা যায় বল

তো ভাই? অবশ্য নতুন কারবার ফাঁদবার মত পয়সা আমার নেই।

—তোমার যেমন বুদ্ধি! ব্যবসা করতে গেলে সব সময় মূলধনের প্রয়োজন হয় না। ঘটে ফন্দি আঁটবার মত বুদ্ধি থাকলেই হল। আপাতত টাকা রোজগারের একটা ফন্দি বাতলাতে পারি।

—কি বল তো?

—কার্তার সিংকে চেন তো? ওই যে বাজারের সাইকেলের দোকানদার কার্তার সিং নেহাল—সে তোমাকে সহজেই মাসে আটশো টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

—হঠাৎ আমার উপর তার এত দয়া?

—দয়া নয়, একটা ফেবারের বিনিময়ে সে তোমাকে টাকাটা দেবে। তুমি বোধহয় জান সাইকেলের ব্যবসার আড়ালে কার্তার সিং গাঁজা স্মাগলিং করে। সম্প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে তার উপর। সে মাল আর নিজের বাড়িতে রাখতে ভরসা পাচ্ছে না। তুমি মালগুলো তোমার মাটির তলার ঘরে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেই করকরে আটশো টাকা মাসে রোজগার করতে পারবে।

আঁতকে উঠল নিরঞ্জন সিং।

—কি বলছ তুমি! বেআইনী কাজ করব!

বিচিত্র এক হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল পৃথ্বীপাল সিং।

—আজকের দিনে বেআইনী কাজ কে করছে না বলতে পারো? একটা নজীর দেখিয়ে দাও তো, কে আইনের বাঁধা পথ দিয়ে চলে টাকা করতে পেরেছে?

শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনকে রাজী হতে হল। লোভ ভয়ঙ্কর জিনিস—পৃথ্বীপাল নিরঞ্জনের লোভকে উসকে লেলিহান শিখায় পরিণত করল। কথাবার্তা কার্তার সিং-এর সঙ্গে পাকা হয়ে যাবার পরই রাতের অন্ধকারে মাল চলে এল। এরপর দিন গড়িয়ে যেতে

লাগল। প্রতিমাসে আটশো টাকা ঠিকই পেয়ে যেতে লাগল নিরঞ্জন।

সংসারের স্বচ্ছলতা উপচে উঠল। ভয় ভাবটা একেবারেই কমে গেল। ঠিক এই সময় গুরুতর গোলমালটা বাধল। একদিন কার্তার সিং মাল তদারক করতে এসে চিৎকার করে উঠল, একি, মাল এত কম কেন?

নিরঞ্জন বলল, কম আবার কোথায়? গত সপ্তাহে নিয়ে যাবার পর এই তো রেখে গেছ।

—কখনই না। অর্ধেক মাল গায়েব হয়ে গেছে দেখছি।

—কি করে হবে। হাওয়ায় মিলে যাবে নাকি?

ফেটে পড়ল কার্তার, হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। তুমি সরিয়েছ। কতকগুলো নেপালীকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছিলাম, তাদের বিক্রী করে দিয়েছ।

বলা বাহুল্য, এরপর প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল দুজনের। যাবার সময় কার্তার শাসিয়ে গেল পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ না দিলে সে দেখে নেবে। নিরঞ্জন সমস্ত কথা গিয়ে বলল পৃথ্বীপালকে। পৃথ্বীপাল গম্ভীরভাবে বলল, আসল ব্যাপার যাই হোক না কেন, টাকাটা তোমায় দিতেই হবে।

—মগের মুল্লুক নাকি। কেন দেব টাকা?

—না দিলে তুমি বিপদে পড়বে। মাল রয়েছে তোমার বাড়ীতে, পুলিসের কানে কোনরকমে কথাটা যদি কার্তার তুলে দেয়, তাহলে…

চোয়াল ঝুলে পড়ল নিরঞ্জন সিংয়ের। তাই তো। এদিকটা তো সে ভেবে দেখেনি। দু পয়সা লাভ করতে গিয়ে এ কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে মালগুলো বার করে দেবারও উপায় নেই। একটু জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষা থাকবে না। কিন্তু টাকা —পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাবে নিরঞ্জন।

অনেক কথার পর শেষে ঠিক হল সুদে টাকাটা দেবে

পৃথ্বীপাল। আর কার্তার টাকা পাবার পরই মাল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা অন্যরকম দাঁড়াল। টাকা হাত পেতে নিলেও মাল সরিয়ে নেবার কোন লক্ষণ কার্তার সিংয়ের দেখা গেল না। তখন পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল তার অবিক্রীত মাল এই কায়দায় সে নিরঞ্জনকে বিক্রী করেছে।

এরপর স্বাভাবিক নিয়মে যা হওয়া উচিত তাই হল। ঘাড়ে চেপে পড়া গাঁজা ভালমানুষ নিরঞ্জন বিক্রী করতে পারল না। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার তাগাদায় অস্থির করে তুলল পৃথ্বীপাল। অপমানের চুড়ান্ত করল—ভয় দেখাতে লাগল। অসহায় নিরঞ্জনের সমস্ত কিছু মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সেদিন প্রায় মাঝরাত্রে একটা হেস্তনেস্ত করতে পৃথ্বীপাল গিয়েছিল নিরঞ্জনের বাড়ি। এই সময় ওরা অমৃতসর মেল ডিরেল্ড হওয়ার সংবাদটা শুনল। অন্য কথা ভুলে দুজনে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটল। সঙ্গে শেলাও গিয়েছিল। ওখানে পেঁছিবার কিছুক্ষণ পর পৃথ্বীপালের দৃষ্টি পড়ল সুজয়ের উপর। বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় পরিকল্পনা দানা বাঁধল।

সে বলল কথাটা নিরঞ্জনকে। শেলার সাহায্যেই যে কার্যোদ্ধার করা সম্ভব, এ কথাও জানাল। ওই সঙ্গে এ কথাও জানাতে ভুলল না যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিলে নিরঞ্জন সহজেই ঋণ-মুক্ত হতে পারবে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, এই প্রস্তাবে রাজী না হয়ে নিরঞ্জনের উপায় ছিল না। দু-চার কথায় কি করতে হবে পৃথ্বীপাল বুঝিয়ে দিল শেলাকে। তারপর তাকে একটা ঢিপির আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল খানায়।

আর চিতা করবার অবসর পেল না শেলা। জুতোর শব্দে চমকে মুখ ফেরালে দরজার দিকে। সুজয় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কি ভাবছিলে?

ম্লান হেসে শেলা বলল, আমার ভাবনায় কি কোন নতুনত্ব

আছে। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম। তোমাকে তো বলেই গেলাম। আজই এসেছে চাকরিস্থল থেকে এখানে। বললাম তাকে তোমার কথা। সে তো তোমার কথা শুনে অবাক। যাক, কাল সব বলব। এখন চল, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলি গিয়ে।

দুজনে পাশাপাশি খাবার ঘরে গেল। আহার-পর্ব শেষ হতে মিনিট কুড়িকের বেশী লাগল না। খাওয়ার সময় সাধ্যমত সহজ-ভাবে শেলা কথা-বার্তা বলবার চেষ্টা করল সুজয়ের সঙ্গে। বিন্দু-মাত্র ব্যতিক্রম যাতে তাকে সন্দিগ্ধ না করে তোলে সে সম্পর্কে সজাগ রয়েছে।

শেলা মৃদু গলায় প্রশ্ন করল, কফি করব ?

—নিশ্চয়। ঘণ্টাখানেক লেখবার ইচ্ছে আজ। কফি পেটে না পড়লে এক লাইন লিখতে পারব না।

সুজয় চলে যাবার পর দ্রুত হাতে কফি তৈরি করল শেলা। কেটলি থেকে পানীয় ঢালল ফ্লাস্কে। এবার ওকে সেই বিশেষ কাজটি করতে হবে। মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ খচ করে ফুটছে। একটা ইতস্তত ভাব যেন বাধা দিতে চাইছে। এই শীতেও দরদর করে ঘামতে লাগল। এইভাবে কাটল কয়েক মিনিট। শেষে নিজেকে অসীম বলে সংযত করে নিয়ে এধার-ওধার তাকাল। কেউ নেই তো ? কে-ই বা থাকবে। ব্লাউজের মধ্যে থেকে পৃথ্বীপালের দেওয়া মোড়কটা বার করে আনল। হাত কাঁপছে। চেষ্টা করেও হাতের কাঁপুনি বন্ধ করা সম্ভব হল না। মোড়কের মধ্যেকার বাদামী পাউডার অর্ধেকটা ঢেলে দিল কোনরকমে ফ্লাস্কের মধ্যে। গুঁড়োগুলো ভাসতে লাগল টলটলে কালচে কফির উপর, চামচ দিয়ে শেলা মিলিয়ে দিল। ফ্লাস্কটা হাতে তুলে নিয়ে ধীর পায়ে স্টাডিতে চলে এল।

সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের সামনে বসেছিল সুজয়।

ফ্লাস্কটা রাখতে রাখতে শেলা হাই তুলল।

—তোমার তো ঘুম পেয়ে গেছে দেখছি। সুজয় বলল, শুয়ে পড় গিয়ে। আমিও ঘণ্টাখানেক লিখে শুয়ে পড়ব।

শেলা কিছু বলল না। সুজয়কে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল। এধার থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়বার উপায় নেই। উপায় থাকলেও যে ঘুম দুচোখে নেমে আসত, এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। আকাশ-পাতাল ভাবছে শেলা। আর দশটা মেয়ের মত তার জীবন সহজ সরল হল না কেন?

পাশের ঘরে ফ্লাস্ক খোলার শব্দ হল। বেচারা সুজয় অজান্তেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। সময় এগিয়ে চলল। একসময় পাশের ঘরের আলো নিভে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলোর আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, তা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় শেলা বুঝতে পারল পাশের ঘরের আলো নিভেছে। ওষুধের ঘোরে এবার সুজয় ঘুমিয়ে পড়বে—সে ঘুম সহজে ভাঙবার নয়।

আরো ঘণ্টাখানেক বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে শেলা উঠে পড়ল। পাশের ঘর থেকে ভারী নিশ্বাসের শব্দ আসছে। সন্তর্পণে দরজার অর্গল খুলে ও ঘরে পা দিল। ফায়ারপ্লেসের চাপা আগুনের আলোয় অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র। বেতের সোফার উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সুজয়। তার উঠে পড়বার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু পা টিপে টিপে ম্যাণ্টল-পিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শেলা। মনে হল পেতলের কৌটোটা যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। কৌটার মধ্যে থেকে চাবিটা বার করে নিল। এগিয়ে গেল আয়রন্ সেফের দিকে। চাবিটা যথাস্থানে পরাতে গেছে মাত্র, ঘরের আলো জ্বলে উঠল দপ্ করে।

হাত থেকে চাবি পড়ে গেল। চমকে মুখ ফেরাল শেলা। সুইচের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুজয়। শেলার অবস্থা প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তের মত।

কয়েক পা এগিয়ে এসে সুজয় বলল, আমি জেগে থাকব তুমি

বোধহয় কল্পনা করতে পারনি ?

শেলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না !

—ঘুমের ওষুধ মেশান কফি আমি খাইনি। অবশ্য সেজন্যে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমার ভুলের খেসারত টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছি। তোমার অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল। ওগুলো নিয়ে যেতে পার। আমি এবার ঘুমোব।

শেলা টেবিলের দিকে তাকাল, তাড়া তাড়া নোট সাজানো রয়েছে। সংখ্যায় ত্রিশ হাজার কি চল্লিশ হাজার না আরো বেশী, কে জানে। বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারল না। দাঁড়িয়ে রইলো ও অনড়ভাবে। সুজয় কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, তোমার চাল-চলন দেখে কথাবার্তা শুনে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের চালচলন তোমার মধ্যে কেমন অনুপস্থিত। তোমার অতীত ছাড়া আর সমস্ত কিছুই তুমি বলতে পারছো—করতে পারছো! একটু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়কি ? কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, পৃথ্বীপাল সন্দেহজনক ভাবে বাড়ির চার-পাশে ঘোরাফেরা করছে। আজ তাকে দেখলাম বাগানের পাঁচিল টপকাতে, জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে। স্বাভাবিক ভাবেই আমি জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—তোমাদের সমস্ত কথাই আমার কানে গেছে। আমি অন্ধ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম, নিজের বুভুক্ষু হৃদয়কে সরস করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম, আর তুমি টাকার লোভে আমার সঙ্গে চমৎকার অভিনয় করে গেছ। যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওই কোণে কাপড়ের থলিটা পড়ে রয়েছে—ওতে সমস্ত টাকা এঁটে যাবে। ওগুলো নিয়ে এবার আমায় রেহাই দাও। নিজের বোকামির উচিত শিক্ষা আমি বিপুল অর্থক্ষতির বিনিময়ে পেতে চাই।

শেলা নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। ঠেলে-আসা কান্নাকে দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে কাঁপাগলায় বলল, ও

পাশে দাঁড় করানো রয়েছে তোমার রাইফেলটা, হাতে তুলে নিতে পার না? তোমার লক্ষ্য যে অব্যর্থ, এ-কথা তুমিই আমাকে বলেছিলে।

—চমৎকার! এখনও অভিনয়?

—অভিনয় নয়। বিশ্বাস কর, এই জীবনের উপর আমার ঘৃণা এসে গেছে। আমি—আমি তো—

—কিছু নতুন কথা যেন তুমি আমাকে শোনাতে চাইছো। কিন্তু আমার মত বোকার সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নয়। সকলের না হলেও, তাদের কারুর কারুর আয়রন্ চেস্টকে হাল্কা করে দেবার দায়িত্ব এড়ানো তোমার সাজে না। কিন্তু আর অপেক্ষা করছো কেন? পৃথ্বীপাল ঠাণ্ডায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চোখের জল আর বাধা মানল না। অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ল শেলার গাল বেয়ে।

আঁচল দিয়ে সে জল মুছে ফেলার চেষ্টা না করে, ভেজা গলায় বলল, আর কত ভাবে বিদ্রূপ করবে? তুমি যখন সব শুনেছো তখন কি বুঝতে পারনি কত অসহায় আমি? কি রকম বেড়া জালে জড়িয়ে পড়ে আমায় এত নীচে নামতে হয়েছে?

শেলা দরজার দিকে অগ্রসর হল।

—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

থামল ও।

—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—জানি না।

—টাকা গুলোর কি হবে—কি বলবে পৃথ্বীপালকে?

কান্না জড়ানো গলায় শেলা বলল, আমি জানিনা—জানিনা। শুধু জানি দাদা আমাকে আর বাড়ীতে জায়গা দেবেন না। এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখন ভাগ্যই আমার সহায়। এই বিশাল দেশে কোথাও কি জায়গা করে নিতে পারব না?

—শেলা—

কি বলতে গিয়েও থামল সুজয় !

শেলা ততক্ষণে চৌকাঠ অতিক্রম করেছে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মুখ ফিরিয়ে ধরা গলায় বলল, ধরা পড়ে গিয়ে ভালই হল, তুমি আমার স্বরূপ দেখতে পেলে। ভবিষ্যতে আমি তোমার কোন উপন্যাসের ঘৃণ্য নারী চরিত্র হয়েই থাকতে চাই। তবে বিশ্বাস কর, অভিনয় করতে এলেও আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি অভিনয় করতে পারিনি। তুমি আমার জীবনের প্রথম পুরুষ যাকে·······

কথা অর্দ্ধ সমাপ্ত রেখেই ও মিলিয়ে গেল পাশের ঘরে।

সুজয় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শান্ত পরিবেশের উপর দিয়ে যেন প্রবল ঝঞ্চা বয়ে গেল। দরজা খোলার শব্দ হওয়ায় বুঝতে পারা গেল, শেলা বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। সুজয় দৃষ্টি প্রসারিত করল টেবিলের উপর, উজ্জ্বল আলোয় নোটগুলো চকচক করছে। একটা অনাস্বাদিত ব্যথায় চিনচিন করে উঠল তার মন।

বোধহয় পাঁচ মিনিটও অতিক্রম করেনি, ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সতেজ করে তুলল সুজয়। তারপর মনস্থির করে নিতে মিনিট খানেকের বেশী সময় লাগল না ! সে দ্রুত পায়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল, নামল বাগানে। শেলা বা পৃথ্বীপাল কেউ নেই।

বাগানের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই দেখতে পেল, প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে চলেছে শেলা, আর ওর পিছনে পৃথ্বীপাল। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ক্ষুধার্ত শার্দুল যেন প্রাণ রক্ষায় মরিয়া হরিণীর পিছনে ধাবিত—।

আবছা অন্ধকারে দুজনকে কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

নিজের গতি দ্রুত করল সুজয়। তার পায়ের শব্দ কাছাকাছি পৌঁছাতেই পৃথ্বীপাল মুখ ফিরিয়ে দেখল। তার গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ রইল না। একবার থমকে দাঁড়িয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের গলিতে।

সুজয় শেলার পিছনে গিয়ে পৌঁছাল, তখন সে হাঁপাচ্ছে।

—শেলা—

শেলা থমকে দাঁড়াল।

—তুমি কেন এলে ?

—ফিরে চল—

—না—না—

সুজয় ওর একটা হাত ধরল।

—ফিরে চল। তোমাকে নষ্ট করে দেবার অধিকার আমার নেই।

শেলা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, কেন বুঝতে পাচ্ছ না তা হয় না। ও কথা তুমি আমাকে আর বলো না।

—আমি ছাড়া এখন তোমাকে আর কে বলবে ? আজকের জগৎকে তুমি চেননা। তুমি নষ্ট হয়ে যাবে। দোষ আমারই। নাটকীয় পরিস্থিতির অবতারণা না করে আমি আগেই সব সামলে নিতে পারতাম। তোমার অসহায় অবস্থার কথাতে বুঝতে পেরেছিলাম। তখনই চাবকাতে পারতাম পৃথ্বীপালকে। যা হয় হোক শেষ পর্যন্ত যে নিজের ভুল সুধরে নিতে পেরেছি এই যথেষ্ট। চল, আমরা বাড়ী ফিরে যাই।

অশ্রু আকুল শেলা শীর্ণ গলায় বলল, ছেলে মানুষী করো না। আমার ব্যর্থ-জীবনের বোঝা তুমি কেন মিথ্যে বয়ে বেড়াবে।

—তোমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত মলিনতাকে ধুয়ে মুছে ফেলার এইতো অবকাশ, সে সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার তুমি কে ? আমি জানি আগামী দিনে আমরা সুখী হব।

—কিন্তু—

সুজয় কাছে টেনে নিল শেলাকে। নিবিড়ভাবে নিজের বুকের সঙ্গে ওকে মিশিয়ে ফেলতে চাইল। কাগজ কলমে অসংখ্য নায়ক সৃষ্টি করেছে। আর এখন, বাস্তব জীবনে তার কার্যকলাপ নায়কচিত ছাড়া আর কি ?

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু গলায় বলল, অতীতের কথা এবার সত্যিই ভুলে যাও। পৃথ্বীপাল নামে কাউকে তুমি কখন চিনতে না, কখন দেখনি।

শেলা আর কিছু বলতে পারল না। ঠাণ্ডায় নয়, বোধহয় গভীর সুখাবেগেই ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সিক্ত করে তুলল সুজয়ের বুক।

এই সময় থানার পেটা ঘড়িতে সশব্দে একটা বাজল। সুপ্তির কোলে ঢলে আছে বারবিঘা। শুধু এই হিমশীতল রাতে দুটি আত্মশীল নরনারী এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ থাকবে ওরা নিজেরাও বোধহয় জানে না।

দুই

ঝড় উঠেছে।

চন্দ্রালোকিত রাত ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আস্তরণের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে অনেক আগেই। ওই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে প্রবল বর্ষণ। অকাল বর্ষণ। মধ্যপ্রদেশে এই সময় বৃষ্টি হয় না। সন্ধ্যার সময় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি গভীর রাত্রে এখন ঝড়-জলের মাতামাতি দেখা যাবে।

ঘুম ভেঙে গেল চন্দনার।

শীত-শীত করার দরুনই ঘুম ভেঙে গেল। আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে, বিদ্যুতের প্রবল চমক ওকে সচকিত করে তুলল। ঝড়-জল সম্পর্কে সচেতন হল চন্দনা। দ্রুত উঠে বসল বিছানার ওপর।

খোলা জানলা দিয়ে জলের ছাট এসে অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে ঘরের। খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ করে দিল চন্দনা। আলো জ্বালল তারপর। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে জলের ছাটে মুখ ভিজে গিয়েছিল। কাপড়ও শুকনো ছিল না। আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখ মুছল।

শাড়িটা বদলে নিলে ভাল হয়। বদলাতে গিয়েও কিন্তু বদলাল না। এই মাঝরাত্রে ধোয়া শাড়ির পাট ভাঙা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না, একথা চন্দনা বিবেচনা করে দেখল। যেটুকু ভিজেছে তাতে ওর শরীর গলে যাবে না। আলনায় তোয়ালেটা রেখে ঘড়ির দিকে তাকাল, কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে।

বিছনার দিকে তাকিয়ে হাঁই তুলল চন্দনা—আর ঘুম আসবে না। আজ বলে নয়। চিরকালই। একবার ঘুম ভেঙে গেলে বহু চেষ্টা করেও দ্বিতীয়বার ঘুম তার আসে না। বাকি সময়টুকু চিন্তার অতলান্ত সমুদ্রে ও সাঁতরে বেড়িয়েছে।

ধীর পায়ে চন্দনা বারান্দায় এল। ঘরের কোলেই বারান্দা।

টানা বারান্দা ধরেও কিছুদূর এগিয়ে গেল। বিরাট বাড়িটা নিস্তব্ধ-নিঝুম। কোথাও কেউ জেগে নেই বোধ হয়। কোথাও শব্দ হচ্ছে না। শুধু থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে ঝড় ও জলের অশান্ত আর্তনাদ।

বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল চন্দনা।

এই সমস্ত অবকাশে ফেলে-আসা দিনের অনেক কথা তার মনে ভীড় করে আসে। চন্দনা নিজেকে মাঝে মাঝে বোঝাবায় চেষ্টা করে, কি হবে ভেবে! ভাগ্যে যা ছিল তা হয়েছে, যা হবার তা হবে। কিন্তু ভাগ্যের দোহাই দিয়ে মনকে বেঁধে রাখা যায় না।

রাস্তার একাংশ দেখা যাচ্ছে। নর্দমা ঢাকা নয়, তবু বৃষ্টির জল জমে গেছে রাস্তায়। একটা কুকুর—আবছা অন্ধকারের মধ্যে ভাল দেখা যাচ্ছে না, ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ তুলে চলেছে। ওদের বিচিত্র করুণ জীবন। কোনরকমে বেঁচে থাকবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করতে হয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এলোমেলো ভাবে কত কথাই না চিন্তা করল চন্দনা। এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বুঝি-বা। হঠাৎ ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। চমক ভাঙল ওর।

এত রাত্রে আবার কে এল!

থেমে থেমে কলিংবেল বেজে চলল।

ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কলিংবেলের ঝনঝনানি পরিষ্কার-ভাবে কানে এসে বাজছে। কেউ এসেছে সন্দেহ নেই। ইতস্ততঃ করতে লাগল চন্দনা। আর কেউ জেগে নেই বাড়িতে ওর কর্তব্য গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আগন্তুককে ভেতরে আসতে দেওয়া। কিন্তু···

এই গভীর রাত্রে দরজা খুলতে যাওয়া কি ওর পক্ষে অসম সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে না?

বেজে চলেছে কলিংবেল।

নিজের ইতস্ততঃ ভাবকে জয় করল চন্দনা। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি

দিয়ে নেমে গেল। একটু দ্বিধা করল, তারপর দরজার ইয়েল লকের চাবি ঘোরাল।

সজোরে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল একজন। দীর্ঘকায় আগন্তুকের সারা গা ভিজে জব্‌ জব্‌ করছে। হাতে একটা ছোট সুটকেশ। সুটকেশটা নামিয়ে রেখে সে আবার বাইরে গেল। বাইরে থেকে নিয়ে এল হোল্ডলে মোড়া বিছানা। হোল্ডল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে।

বিস্মিত চন্দনা আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখছিল। এবার অসংলগ্ন ভাবে উচ্চারণ করল, আপনি···

আগন্তুক ভিজে রুমাল দিয়ে নিজের ভিজে মুখ মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, ট্রেন ঘণ্টা ছয়েক লেট ছিল, তাই এ বিড়ম্বনা।

—ট্রেন। মানে···

—আমি বিকাশের বন্ধু। অনুগ্রহ করে তাকে যদি একবার ডেকে দেন—

—ও, আপনিই সোমনাথবাবু? আপনার তো সন্ধ্যার দিকে আসার কথা ছিল?

—ট্রেন লেট ছিল বললাম তো! বিকাশ কি—

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত বিকাশকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।

সোমনাথ কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—হ্যালো বিকাশ—

বিকাশ নেমে এসেছে।

বলল, আমরা তো ভাবলাম এলে না বুঝি! এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম!

—কলকাতা থেকে যাত্রা আমি ঠিকই সময়েই করেছিলাম। মাঝপথে এক বিপত্তি। মালগাড়ির কয়েকটা খালি ওয়াগন কি করে যেন উল্টে গিয়েছিল। সরাতে সরাতে সময় গেল অনেক।

আমাদের ট্রেনও লেট হয়ে গেল।

মৃদু হেসে বিকাশ বলল, যাক, শেষ পর্যন্ত যে এসে পড়তে পেরেছ এই যথেষ্ট। কিন্তু ভিজে যে একেবারে জব্‌জবে হয়ে গেছ হে!

সোমনাথও হাসল।

—না ভিজে উপায় কি? তোমাদের দেশে অসময়ে যা বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে! এখন এককাপ চা খাওয়াতে পার বিকাশ? চা না খেলে ঠিক নিউমোনিয়া ধরবে। ওই রোগ এই বয়সে হলে তুমি কি ভেবেছ বাঁচব আমি!

কথা শেষ করেই ও জোরে হেসে উঠল।

চন্দনা আর দাঁড়াল না ওখানে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে। এখন কি ও আবার বিছানায় আশ্রয় নেবে।

বিকাশ বলল, নিশ্চয় খাওয়াব। আমার ঘরে ফ্লাস্কের মধ্যে চা আছে। কিন্তু এখন তোমার প্রধান কাজ হল জামা-কাপড় বদলানো। এস, ওপরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল দুজনে।

কয়েক ধাপ উঠে যাবার পর সোমনাথ বলল, কি ব্যাপার বলো তো?

—কিসের কি ব্যাপার!

—তার করে ডেকে পাঠালে?

—নিজে থেকে তো আসবে না, তার তাড়া দিয়ে আনাতে হল। আচ্ছা সোমনাথ, একটা কথা আমায় বুঝিয়ে বলতে পার?

—একটা কেন, সম্ভব হলে তোমাকে এক হাজারটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারি।

—তোমরা এত কলকাতা কেন্দ্রিক কেন বলো তো? বছরের পর বছর ধরে ওখানে থেকে থেকে কি এত আনন্দ পাও?

—আনন্দ! তুমি আমায় অবাক করলে বিকাশ। কলকাতায় আনন্দ করবার আছেটা কি? পেটের চিন্তায় ব্যস্ত থাকি বন্ধু।

সময় কখন কোন্‌ দিক দিয়ে যে কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারি না।

সোমনাথের বলার ভঙ্গীতে বিকাশ হেসে উঠল।

—তোমার আবার পেটের চিন্তা কি হে? ব্যাংক ভর্তি টাকা। ওই টাকার সুদেই তো রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পার। তার ওপর আবার মোটা মাইনের চাকরি করছ।

দুজনে বিকাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু আমার চিন্তার শেষ নেই। সে সমস্ত কথা হয়তো আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

—বুঝিয়ে আর বলতে হবে না। এখানে যে এসে পড়েছ এই অনেক। অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম আছে, আগে কাপড়-জামা বদলে এস।

সোমনাথ বাথরুমে গেল।

জামা-কাপড় বদলে ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে।

কোচে বসতে বসতে বলল, ওই মেয়েটি কে হে?

—তোমায় যে দরজা খুলে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় চা ঢেলেছিল বিকাশ। চায়ের কাপ সোমনাথের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, বড়দার মেয়ে মন্তুর গভর্নেস।

ঝড় তখন অনেক কমে গেছে। বৃষ্টিও ধরে এসেছে।

ভূপালে বাঙালীর সংখ্যা বেনারস, কানপুর, লক্ষ্ণৌ বা এলাহাবাদের মত নয়। এইটুকু বলা চলে মোটামুটি কিছু-সংখ্যক বাঙালী এখানে আছে। বিনায়ক চৌধুরী এই ঐতিহাসিক শহরে বসবাস করছেন প্রায় ত্রিশ বছরের ওপর। অবশ্য একথা ভেবে নিলে ভুল হবে যে, চাকরির ব্যাপারে বিনায়ক এখানে এসেছিলেন এবং রিটায়ার করার পর অন্যত্র না গিয়ে এখানেই রয়ে গেছেন স্থায়িভাবে।

জীবনে চাকরি তিনি করেননি।

কলকাতায় থাকতেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে। বিরাট বাড়িখানা তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর্দা। তিনি প্রথম জীবনে অল্প বিত্তের মানুষ ছিলেন। এক বন্ধুর সহযোগিতায় পাটের ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন শেষ বয়সে। বিনায়কের বাবা বিজন-কৃষ্ণ ব্যবসার ধারে ঘেঁষলেন না। আবার অলসভাবে বসে বসে বাপের সঞ্চয়কে নিঃশেষ করে দিতেও তাঁর মন চাইল না! ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। সুতরাং তখনকার দিনে সহজেই একটি সওদাগরি অফিসে চাকরি হয়ে গেল তাঁর।

বিনায়কের বিদ্যাও ম্যাট্রিক পর্যন্তই।

চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তিনি চেয়েছিলেন ঠাকুর্দার পাটের ব্যবসাকে আবার জাঁকিয়ে আরম্ভ করবেন। কার্যক্ষেত্রে নেমে কিন্তু আশার আলো দেখতে পেলেন না। দিনকাল এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাও অন্য ধারে মোড় নিয়েছে। সেই মোড়ে পৌঁছান অনভিজ্ঞ বিনায়কের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই রকম যখন পরিস্থিতি বিজনকৃষ্ণ বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

শান্তিপূর্ণ চৌধুরীবাড়িতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আরম্ভ হল ভাইয়ে-ভাইয়ে স্বার্থের হানাহানি। যেন চারজনে অপেক্ষা করছিলেন বিজনকৃষ্ণর মৃত্যুর জন্য। বিনায়ক তখন বিবাহিত। একটি সন্তানের জনক। তিনি প্রায় স্থির করে ফেললেন, এই নোংরামির মধ্যে থাকবেন না। পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকলে এবং এই বাড়িতে বসবাস করলে নোংরামিকে কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

এখন একমাত্র উপায় সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেওয়া। তারপর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করা।

আইনজ্ঞর মাধ্যমে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। বিনায়ক নিজের বাড়ির অংশে ভাড়াটে বসিয়ে সপরিবারে বকুলবাগানে চলে গেলেন। ছোট একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল সেখানে। এবার বিনায়ক চিন্তা করতে লাগলেন কোন্ পথ দিয়ে তাঁর প্রচুর অর্থাগম

হতে পারে।

পৈতৃক সম্পত্তি কিছু কম পাননি। তবে কথাতেই আছে ঘড়ার জল বারংবার গড়িয়ে নিলে ঘড়া একদিন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং নিষ্কর্মা বসে থেকে সম্পত্তি বিক্রী করে খেতে থাকলে তা শেষ হতে আর কতদিন সময় নেবে?

কাজেই তাঁকে যেতে হল অমিয়নাথের কাছে।

অমিয়নাথ বিনায়কের বাল্যবন্ধু। একই সঙ্গে দুজনে স্কুলে পড়েছিলেন। বর্তমানে অমিয়নাথ চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। তিনি একজন নামকরা কণ্ট্রাক্টর। অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে দেখা হল। কথা হল অনেক সুখ-দুঃখের। শেষে বিনায়ক নিজের মনের কথা বললেন।

বললেন, বাঁধাবন্দী অবস্থার মধ্যে আমি থাকতে পারি না তা তুমি জান। এই কারণে চাকরি কোথাও করতে পারলাম না। অথচ কিছু একটা না করলেই নয়! এখন আর বটের ছায়ায় নেই। তোমার কাছে এলাম পরামর্শ নিতে। এখন তুমিই বলতে পারবে কি ধরনের ব্যবসা আমায় সন্তুষ্ট করবে।

অমিয়নাথ চিন্তা করলেন কিছু সময়।

বললেন তারপর, গোল্ড মাইনের সন্ধান আমি তোমাকে সহজেই দিতে পারব! কিন্তু তুমি কি রাজী হবে?

—রাজী হব না মানে! না শুনেই আমি রাজী একথা তোমায় জানিয়ে রাখতে চাই।

—ছেলেমানুষি কর না বিনায়ক। আমার কথা মন দিয়ে শোন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কণ্ট্রাক্টরি করে অতি সহজেই অজস্র টাকা উপায় করা যায়। অবশ্য ভাগ্যকে তোমার পক্ষে রাখতে হবে। যা হোক, সম্প্রতি একটা বড় কণ্ট্রাক্ট আমার হাতে এসেছে। কাজটা ভূপালের। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ওখানে যেতে পারব না—তুমি যদি রাজী থাক তো বল, কাজটা তোমায় পাইয়ে দিই!

—আমি রাজী আছি। কিন্তু ও সমস্ত বিষয়ে তো আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই!

—কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা হয়। আমিও, অনেক ঠকে শিখেছি। অবশ্য এসম্পর্কে আমিও তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারব। আমার কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে দেব। তারা তোমার সমস্ত অসুবিধাকে কাটিয়ে দেবে।

বিনায়ক ভূপালে গেলেন।

অনেক টাকার কণ্ট্রাক্ট ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হল। প্রচুর না হলেও মোটামুটি লাভ হল তাঁর। নতুন কাজ ধরলেন আবার। কিছুদিনের মধ্যে ভূপালে অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই অর্জন করলেন তিনি। স্থানীয় লোকেরা তাঁর নাম দিল চৌধুরী সাহেব।

ইতিমধ্যে কলকাতার বকুলবাগানের বাসা ছেড়ে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সকলকে নিয়ে ভূপালে চলে এসেছেন চৌধুরী-সাহেব। দুটি নবাগত অতিথিরও আগমন হয়েছে পরিবারে। বর্তমানে স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সুখে আছেন তিনি।

সময় কেটে চলল।

বছরে এক-আধবার কলকাতায় যান চৌধুরীসাহেব। অমিয়-নাথের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। অমিয়নাথও স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে ভূপালে আসেন। দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে। কিন্তু এই প্রবাহ বজায় রইল না।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অমিয়নাথের স্ত্রী-বিয়োগ হল। কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হননি তিনি। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। সোমনাথ মাত্র সাত বছর বয়সে মা-হারা হল।

স্ত্রী-বিয়োগের পর কেমন নিরাসক্ত হয়ে পড়লেন অমিয়নাথ। কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। এতদিনের চালু ব্যবসা ছ'মাস পরেই

বন্ধ করে দিলেন। ব্যবসায়ী জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন তিনি। তাঁর সময় কাটতে লাগল ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে ডুবে থেকে।

সোমনাথকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বোর্ডিং-এ।

বিনায়ক কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন সোমনাথকে নিজের কাছে এনে রাখবার। তাঁর ছোট ছেলে বিকাশের সঙ্গে থেকে একই সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারবে। অমিয়নাথ রাজী হননি। কোন কারণ না দেখিয়েই প্রতিবার বিনায়কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

লেখাপড়ায় অবশ্য সোমনাথ খারাপ ছিল না। প্রতিবার ভাল ফল দেখিয়েই সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তার দুর্ভাগ্য—সেই বছরই করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে মারা গেলেন অমিয়নাথ। তখন তার কতই বা বয়স! চোখে অন্ধকার দেখেছিল সে। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারও তাকে কম ব্যথিত করেনি। সোমনাথ অসীম বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। ভর্তি হল কলেজে।

যথা সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবার পর ইংলণ্ডে গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষা শেষ করে ইংলণ্ড থেকে ফিরেছে বছর দেড়েক। বর্তমানে উচ্চপদেই কাজ করছে। কলেজে বছর দুয়েক তার সঙ্গে বিকাশ পড়েছিল। দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল তখনই।

সে বন্ধুত্বের জের এখনও আছে।

তাই বিকাশের তার পাবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে ভূপালে চলে এসেছে সোমনাথ।

ভোর হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

বাকি রাতটা আর বিছানায় আশ্রয় নেয়নি চন্দনা।

টেবিল ল্যাম্প জেবলে, হ্যারিংটন চেয়ারে বসেছিল একটা বই হাতে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, ঘুম যখন আসছে না বই পড়তে পড়তে রাতটা কাটিয়ে দেবে। কয়েক পাতা পড়ার পর ঝিমুনি এসেছিল ওর। তারপর কখন যে ভোর হয়ে গেছে চন্দনা জানে না।

দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। মাটি ভিজে না থাকলে বোঝবার উপায় নেই গতকাল রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে। ধোয়া আকাশে সূর্যের আলো পড়ে চমৎকার দেখাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে চন্দনা বাথরুমে গেল।

ওর এখন অনেক কাজ।

বেশ গভীর রাত্রে গল্পগুজব করে ঘুমিয়ে—গভীর না বলে রাত্রের শেষ বলেই ঠিক বলা হয়, তবু সোমনাথের ঘুম ভাঙল প্রতিদিনকার মত ভোরেই। বিকাশ তখনও ঘুমুচ্ছে। কান না পেতেই তার নাকের জলদ গম্ভীর শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে।

সোমনাথ সিগারেট ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, বিকাশের বিছানার কাছে গিয়ে বলল, ওহে কুম্ভকর্ণ, উঠে পড়। সকাল হয়েছে।

এই ডাকে কুম্ভকর্ণের ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নাক পূর্ববৎ শব্দ করে চলল। সোমনাথ এবার তাকে ধাক্কা দিল।

—এই বিকাশ, উঠে পড় দুপুর হয়ে গেল যে!

—অ্যাঁ···দুপুর···

—হ্যাঁ, হে। বেলা অনেক হয়েছে।

—ক'টা বেজেছে?

—পৌনে সাতটা।

বিকাশ আবার পাশ ফিরে শুলো।

—এই, উঠে পড়। আজ সকালটা চমৎকার। চল, কোথাও বেড়িয়ে আসি। দু'মিনিট সময় দিচ্ছি তোমায়। না উঠলে ঠিক মাথায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে দেব।

অগত্যা বিকাশকে উঠতে হল।

ব্যাজার মুখে বলল, এই সাত-সকালে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো!

সোমনাথ সিগারেটের টুকরোটা অ্যাস ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে

বলল, কাঁচা ঘুম ! তুমি বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোও নাকি প্রত্যহ ?

—দশটা না হলেও, সাড়ে আটটা পর্যন্ত তো বটেই।

—ভেরি ব্যাড় বিকাশ। এইভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, সময়ও নষ্ট হচ্ছে।

বিকাশ বিছানা থেকে নেমে হোয়াটনটের কাছে এগিয়ে গেল। হোয়াটনটের ওপর সিগারেটের টিন ছিল। তা থেকে একটা সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিয়ে বলল, স্বাস্থ্য যে নষ্ট হচ্ছে না আমাকে দেখে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আর সময় ? এন্তার সময় নিয়ে আমি কি করব ভাই ?

—সময় নিয়ে মানুষ করে কি ? সোমনাথ বলল, কাজের পেছনে সময়কে লাগিয়ে দাও, বুঝতে পারবে সময়ের কত দাম ! চুপচাপ বসে থাক কি করে ? কিছু করতে ইচ্ছে করে না ?

—বাবা যে সমস্ত কাজ আমায় দেন তা ভাই আমার মোটেই করতে ইচ্ছে করে না।

—কেন ?

—ইন্টিরিয়রে যে সমস্ত কাজ ধরা হয়, বাবা আমাকে সেখানে যেতে বলেন। তুমিই বল, অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কুলী ঠেঙ্গাতে কি ভাল লাগে ?

সোমনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। এই সময় বাইশ তেইশ বছরের একটি তরুণী ঘরে প্রবেশ করল। একহারা ও দীর্ঘাঙ্গী সে। গায়ের রঙ বেশ ফরসা। মুখ-চোখ ভালই।

পলা—চৌধুরীসাসেবের মেয়ে।

পলা সোমনাথকে দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথমে কিছু বলতে পারল না। ওর মুখের ভাব দেখে ওরা দুজনে হেসে উঠল।

বিকাশ বলল, কিরে, অবাক হয়ে গেছিস ?

অবাক হব না। কি বলছ ছোড়দা ? পলা বলল, ট্রেনের টাইম পার হয়ে গেল, সমুদা এলেন না। আমরা তো স্থির করেই নিয়েছিলাম উনি কোন কারণে কলকাতায় আটকে পড়ে গেছেন।

সোমনাথ বলল, দেখছ তোমাদের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে আমি পৌঁছে গেছি। আসল ব্যাপার হল, ট্রেন অত্যন্ত লেট ছিল। রাত আড়াইটের পর এখানে পৌঁছেছি।

তাই বল! দরজা খুলে দিল কে? ছোড়দার ঘুম তো এত সহজে ভাঙবার নয়! রামকিশোর বোধ হয়?

বিকাশ বলল, তোরা কথায় কথায় আমার ঘুমের খোঁটা দিস। সমু পৌঁছবার পরই আমি তাকে রিসিভ করেছি। অবশ্য দরজা খুলে দিয়েছে চন্দনা।

—চন্দনা!!

—এতে প্রমাণিত হয়ে গেল আমাদের চেয়ে ওর ঘুম অনেক পাতলা।

মা-বাবা বোধহয় জানেন না এখনও সমুদা এসেছেন। যাই, তাঁদের গিয়ে খবর দিয়ে আসি।

পলা দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই বন্ধুতে আবার পুরানো আলোচনায় ফিরে গেল।

প্রতিদিন সাড়ে সাতটায় মন্তুকে পড়াতে বসে চন্দনা।

আজও তার ব্যতিক্রম হল না। মন্তু ওর অত্যন্ত বাধ্য হলেও পড়তে বসার পর দুষ্টুমি করতে থাকে। তার পড়তে ভাল লাগে না। বছর সাতেকের ফুটফুটে মেয়ে। কথাবার্তায় খুব পাকা।

চন্দনা তাকে যে পড়া দিয়েছিল সে তার কিছুই করেনি। যা বুঝিয়ে দিয়েছিল সমস্ত ভুলে গেছে। চন্দনা গোটা কয়েক বিরূপ মন্তব্য করল।

মন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে দুষ্টুমি ভরা গলায় বলল, আপনি আমায় এত বকেন কেন চন্দাদি?

—সাধে কি বকি! লেখাপড়ায় তোমার একেবারে মন নেই। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে তার কাছে তুমি মার খেতে।

—আজ পড়া থাক চন্দাদি। আমার ভীষণ বেড়াতে যেতে ইচ্ছে

করছে। আমার বেড়াতে নিয়ে চলুন না!

—মন্তু, দুষ্টুমি কর না।

—চলুন না চন্দাদি!

—আঃ মন্তু! ভেবেছিলাম এখান থেকে যাব না। কিন্তু এবার আমায় চলেই যেতে হবে—

—যাবেন না চন্দাদি। আপনি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

—তোমার খারাপ লাগলে আমি কি করতে পারি বল? তুমি লেখাপড়া করবে না, আমার এখানে থেকে লাভ কি!

মন্তু চোখ ছলছলিয়ে কি একটা বলতে গিয়ে, দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তে আর বলল না। তার পিসী ঘরে প্রবেশ করল গম্ভীর মুখে কোন ভূমিকা না করেই সে বলল, শুনলাম কাল রাত্রে তুমি নাকি এক রোমাণ্টিক অ্যাডভেঞ্চার করেছ?

চন্দনা অবাক হয়ে গেল।

—অ্যাডভেঞ্চার আবার রোমাণ্টিক হবে কি করে? আমি আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—কাল রাত্রে তুমিই নাকি সমুদাকে রিসিভ করেছ?

—ও, হ্যাঁ। মানে···

—সাত-তাড়াতাড়ি তোমার কি দরকার ছিল দরজা খুলে দেবার? বাড়িতে কি আর লোক ছিল না?

—ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হঠাৎ কলিংবেল শুনে···

তীক্ষ্ণ গলায় পলা বলল, সব সময় বেশি ফরোয়ার্ড হওয়া ভাল নয়। সমুদা না হয়ে যদি অন্য কেউ হত? এইভাবে তুমি তো কোনদিন মাঝরাতে একদল ডাকাতকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেবে!

চন্দনা একথার কি উত্তর দেবে! ইতস্ততঃ করতে লাগল।

সোমনাথ ও বিকাশ ঘরে এল।

ঘরে ঢুকেই বিকাশ বলল, পলা, আমাদের চা এই ঘরে দিয়ে যেতে বল।

পলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সোমনাথ কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, ভাগ্যিস কাল ইনি জেগে ছিলেন, নইলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হত কে জানে!

—এই বিপদ তো তুমি ইচ্ছাকৃত ভাবে ডেকে এনেছিলে ভাই। বাকি রাত ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে এলেই পারতে।

—তা পারতাম। ভেবেও ছিলাম সেকথা। আবার কি খেয়াল হল বৃষ্টির মধ্যেই রওনা দিলাম।

—ওকথা থাক বিকাশ বলল, যা বলছিলাম তোমায়। শিকারে যাবার এই হল চমৎকার সময়। তুমি যদি সত্যিই ইণ্টারেস্টেড হও তো বল, কালই সমস্ত ব্যবস্থা করি।

—বেশ তো। আমার আপত্তি নেই। অনেকদিন হল শিকারে যাইনি। শেষবার গিয়েছিলাম বছর আড়াই আগে স্কটল্যাণ্ডের এক জঙ্গলে।

মহা বিস্ময়ে বিকাশ বলল, তুমি ওদেশের জঙ্গলেও শিকার করে এসেছ!

—আর বল কেন? এক গুজরাটি বন্ধু পারেখের পাল্লায় পড়ে যেতে হয়েছিল। ভাল কথা, তোমাদের এখানকার জঙ্গলে জন্তু পাওয়া যায় কেমন? বন্দুক ঘাড়ে করে গেলেই তো চলবে না, তাক করে গুলি ছুঁড়তে গেলে মনের মত জন্তু তো চাই।

—কত চাই? মদনপুরা ফরেস্ট হল মধ্য ভারতের বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে সবকিছু পাওয়া যায়। এই তো গত মাসেই মেজর চক্রবর্তী দুটো লেপার্ড মেরেছেন। আমি সঙ্গে ছিলাম তাঁর।

—লেপার্ড মারা অত্যন্ত শক্ত। ওরা ভীষণ সতর্ক। তুমি অ্যারেঞ্জ কর। দেখি গোটা কতক মারতে পারি কিনা!

—গোটা কতক! যদি একটা মারতে পার, জানবে তোমার অত্যন্ত গুড লাক।

চা নিয়ে পলা ঘরে ঢুকল।

পেয়ালা দুটো ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মন্তু, এই হট্টগোলের মধ্যে তোমার পড়া হবে না। তুমি পাশের ঘরে যাও।

মন্তুকে পাশের ঘরে যেতে বলার অর্থ হল চন্দনাকে পাশের ঘরে যেতে বলা হচ্ছে। মন্তু নিজের বইপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল। চন্দনাও।

সোমনাথ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আপনি ব্যস্ত মনে হচ্ছে! আরেক সময় কথা হবে। আমাকে নিউমোনিয়ার হাত থেকে কাল রাত্রে বাঁচিয়েছেন একথা আমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কথা শেষ করে হাসল একটু।

চন্দনা ঘাড় নেড়ে মন্তুকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সোমনাথ আবার বলল, এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে বাঙালী গভর্নেস পেলে কোথা থেকে?

বিকাশ বলল, পেপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। আবেদন এসেছিল প্রচুর। বাবা ওকেই বেছে নিয়েছেন।

—সিলেকশন ভালই হয়েছে। ভদ্রমহিলা বেশ কেতাদুরস্ত মনে হল।

—কেতাদুরস্ত না ছাই! পলা বলল, ওই রকম পোজ নিয়ে থাকে। আসলে গভীর জলের মাছ।

বিকাশ বোধহয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ খোলবার আগেই চৌধুরীসাহেব ঘরে এলেন। উচ্চতায় তিনি ছ'ফিটের ওপর হবেন। বয়স বাষট্টি পেরিয়েছে, কিন্তু এখনও বেশ মজবুত।

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কাল বৃষ্টিতে ভিজেছ শুনলাম। শরীর খারাপ বোধ করছ না তো?

সোমনাথ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আজ্ঞে না, ভালই আছি। ট্রেন লেট ছিল। ঠিক সময়ে এসে পড়লে আর বৃষ্টিতে ভিজতে হত না।

চৌধুরীসাহেবের ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে সিগার

ছিল। নিভে গিয়েছিল, ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

বললেন, দেশ স্বাধীন হবার পর এই এক হয়েছে। কথায় কথায় চার-পাঁচ ঘণ্টা করে ট্রেন লেট। যাক, এসে পড়েছ তুমি, খুব খুশি হলাম। এখন মাস খানেকের আগে এখান থেকে যাওয়া চলবে না।

—আমি দশ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—দশদিন! সে কি কথা! না, না—তার করে ছুটি বাড়িয়ে নাও। একে তো আসতেই চাও না, এতদিন পরে যখন এসেছ, দশ দিন থাকবে কি?

—দেখি—

—দেখি নয়। আজই তার করে দাও।

এরপর অন্যান্য কুশল-প্রশ্ন করলেন চৌধুরীসাহেব। বিলেতের নানা কথা জানতে চাইলেন। সোমনাথ যথাযথ উত্তর দিল।

এক সময় বিকাশ গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, একটা শিকার পার্টির ব্যবস্থা করছি বাবা। সমু অনেকদিন শিকারে যায়নি বলছে। তুমিও যাবে তো আমাদের সঙ্গে?

না, না, আমি যাব না। কয়েকদিন ধরে লো প্রেসার যাচ্ছে। মাচায় বসে যদি অসুস্থতা বোধ করি, তোমরাই বিপদে পড়বে। তোমরা ঘুরে এস।

সিগার নিভে গিয়েছিল। আবার চৌধুরীসাহেব ধরালেন।

ওরা চায়ে মন দিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ড্রইংরুমের সোফায় মিসেস চৌধুরী গা এলিয়ে বসেছেন। এ ঘরে বড় একটা তিনি আসেন না। তবে প্রতিবেশিনীরা কেউ এলে তাকে নিয়ে এই ঘরেই এসে বসেন। নিজের বৈভবের জেল্লা দেখিয়ে সকলের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেবার উৎকট আগ্রহ তাঁর আছে।

তিনি জানেন তাঁর মত সুসজ্জিত ড্রইংরুম ভূপালে বেশি নেই। লণ্ডন থেকে ডিজাইন আনিয়ে প্রখ্যাত কর্মীদের দিয়ে এই ঘরটি তৈরি করিয়েছিলেন চৌধুরী সাহেব। আসবাবগুলি সমস্তই

সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনানো। যখন আনিয়েছিলেন তখন এক্সচেঞ্জের হাঙ্গামা ছিল না। কোন অসুবিধা হয়নি। মোট খরচ হয়েছিল এক অবিশ্বাস্য অংক।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী মিসেস ঘোষ বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে ড্রইংরুমে বসেছিলেন মিসেস চৌধুরী। আধ-ঘণ্টাটাক গল্পগুজব করে তিনি বিদায় নিয়েছেন। মিসেস চৌধুরী মোটা মানুষ। একবার এক জায়গায় বসে পড়লে সহজে উঠতে পারেন না।

পুত্রবধূ অণিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। বড় বৌকে তাঁর বেশ পছন্দ। সাত চড়েও কথা বলার মেয়ে নয় অণিমা। বিকাশের জন্য এই রকম একটি মেয়ে পেলে নিশ্চিন্ত হন। তবে তার আগে পলার হিল্লে হয়ে যাওয়া দরকার। স্বামী মেয়ের বিয়ের বিষয়ে কিছুই চিন্তা করছেন না দেখে, অনেক গবেষণার পর, বিকাশকে দিয়ে তার করিয়ে সোমনাথকে এখানে ডাকিয়েছেন। চৌধুরী সাহেবকে বলেছেন, তোমার ভরসায় এতদিন থেকে তো দেখলাম। এবার দেখো আমি কি করি। হাতের কাছে পাত্র রয়েছে তাও তোমার খেয়াল ছিল না। মেয়েটার বয়স মিছিমিছি বেড়ে গেল।

মৃদু হেসে চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, চোখের পাশে নাক থাকে গিন্নী। আমরা কি তাকে দেখতে পাই? সোমনাথ খুব কাছের মানুষ তাই তাকে আমি পাত্র হিসেবে ভাবতে পারিনি।

মিসেস চৌধুরী গোটা দুয়েক পান গালে ঠেসে দিলেন। এক চিমটি জর্দাও ফেললেন মুখে। কয়েক সেকেণ্ড চর্বণ সুখ উপভোগ করে, পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে বললেন, সোমনাথকে কেমন দেখলে বৌমা?

—চমৎকার মা। বিলেত ফেরত, এত মোটা টাকা রোজগার করে অথচ গর্বের লেশ মাত্র নেই শরীরে।

—বড় ঘরের ছেলের ওই তো দস্তুর। ও রকম জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—কথা পেড়েছিলেন নাকি ?

—না, এখনও কিছু বলিনি। কয়েক দিন যাক। ওর অমত হবে না। সেই ছোট বেলা থেকে তো দেখছি। তাছাড়া তুমিই বল না বৌমা, শেলাকে অপছন্দ করবার আছে কি ?

কোন কথা না বলে অণিমা মৃদু হাসল।

ঘরের আরেক প্রান্তে রেডিওর সামনে বসেছিল চন্দনা আর মন্তু। প্রতিদিন এই সময় দিল্লী সেণ্টার থেকে ছোটদের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম হয়। মন্তু খুব পছন্দ করে প্রোগ্রামটি।

রেডিও বাজতে থাকা সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রী ও তাঁর পুত্রবধূর কথা চন্দনা শুনতে পাচ্ছিল। প্রোগ্রাম শেষ হল। ড্রইংরুমের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় ও মন্তুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গেল ডাইনিং হলে।

এখন মন্তুর খাওয়ার সময়।

তার সমস্ত কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে হয়।

খাওয়া শেষ করতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগল না। এবার শোয়ার পালা। মন্তু বিছানায় শুয়ে বলল, চন্দাদি, একটা গল্প বল না ! গল্প শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

তার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে চন্দনা বলল, এখন গল্প নয় মন্তু। আমি গান গাইছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

গান শুনতে শুনতে মন্তু ঘুমিয়ে পড়ল।

বড় আলো নিভিয়ে বেডরুম ল্যাম্প জেলে ঘর থেকে চন্দনা বেরিয়ে এল।

এতক্ষণে ওর ছুটি হল।

নিজের ঘরে গেল না চন্দনা। চলল দোতলার ছাদের দিকে। বিকেল থেকেই মাথা ধরছে ওর, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালে সুস্থ বোধ করতে পারে। ছাদে পেঁছে রেলিং ঠেসান দিয়ে আনমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

—শুনুন—

চন্দনা চমকে মুখ ফেরাল।

আলো-আঁধারের মধ্যে সোমনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রশ্নভরা চোখ দুটি চন্দনা ওর দিকে তুলল।

—সেভ করতে গিয়ে দাড়ির তলা খানিকটা কেটে গেছে। আপনার কাছে ডেটল কি টিঞ্চার আইডিন আছে ?

—টিঞ্চার আইডিন—

—কাউকে দেখতে পেলাম না তাই আপনার কাছে থাকলে এনে দিন। রক্ত পড়েই চলেছে।

—আছে। এনে দিচ্ছি।

চন্দনা দ্রুত পায়ে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ডেটলের শিশি নিয়ে এল। খানিকটা তুলোও।

—সোমনাথ আলোর কাছে সরে এসেছিল।

—এই নিন।

—ক্ষতটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। নরম জায়গায় একটু খোঁচ লাগলেও অবশ্য প্রচুর রক্ত পড়ে।

—সোমনাথ মুখ তুলল।

চন্দনা বলল, এ তো অনেকটা কেটে গেছে দেখছি !

—এমন বেকায়দায় কেটেছে যে, আমার পক্ষে রক্ত পরিষ্কার করে ক্ষতে ডেটল লাগান ঝামেলার ব্যাপার।

ইতস্ততঃ করল চন্দনা।

তারপর তুলোতে ডেটল ঢেলে বলল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।

গাঢ় রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ডেটল লাগাবার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চন্দনার হাত থেকে তুলোটা নিয়ে গলায় ঘষতে ঘষতে সোমনাথ বলল, এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন যে ?

—মাথা ধরেছিল বলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়েছিলাম।

—কাল সকালে শিকারে যাবার কথা আছে। ভাবলাম দাড়িটা এই বেলা কামিয়ে নিই। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম বোধহয়,

ব্লেড বসে গেল। আপনাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানেন?

চন্দনা নিজের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলল।

—মনে হয়, এর আগে কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি।

—কলকাতায় দেখে থাকবেন।

—তা হবে। ওখানে কোন্ অঞ্চলে থাকতেন?

—পার্ক স্ট্রীটে।

—পার্ক স্ট্রীটে! ওই অঞ্চলে তো আমার প্রচুর যাতায়াত আছে। কত নম্বর বাড়ি বলুন তো?

—আমি পার্ক স্ট্রীটে একটা অরফান হাউসে থাকতাম।

সোমনাথ অত্যন্ত সচকিত হয়ে পড়ল।

কুণ্ঠিত গলায় বলল, ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে না পেরেই—

মৃদু হাসল চন্দনা।

—আপনি কিন্তু বোধ করবেন না সোমনাথবাবু। ছোট বেলা থেকে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা, অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ মাথায় দিয়ে বড় হতে হয়েছে। তুচ্ছ কথায় মান-অভিমান করা আমার সাজে না।

সোমনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, মেঘ করেছে, আজকেও বৃষ্টি আসবে।

—হ্যাঁ। আপনি ঘরে যান। কাল ভিজেছেন, আজ আবার ভিজলে অসুখ করবে।

কথা ক'টা বলে চন্দনা এড়িয়ে গেল।

ভূপাল শহর থেকে মদনপুরার দূরত্ব মাইল ত্রিশেক হবে। লোকালয় নেই। চতুর্দিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। সঠিক সরকারী হিসেব জানা নেই, তবে সকলে বলে চওড়ায় জঙ্গলটি মাইল কুড়িক হবে, লম্বায় মাইল চল্লিশ। কেন যে জায়গাটির নাম মদনপুরা হয়েছিল এখন আর কেউ বলতে পারে না। পাহাড়ও আছে।

জঙ্গলকে একপাশে রেখে পাহাড় এগিয়ে গেছে সরলরেখার মত। ভুগোলের বইয়ে স্থান পাবার মত না হলেও, কতকগুলি মনোরম

ঝরনা আছে। ঝরনার জল এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কোন বড় নদীর সঙ্গে গিয়ে মিলেছে কিনা কেউ তার খোঁজ রাখে না।

বিকাশের জীপ যখন মদনপুরায় গিয়ে পেঁছিল তখন দুপুর হয়ে গেছে। মাত্র তিনজনের দল। বিকাশ, সোমনাথ আর একজন স্থানীয় শিকারী ত্রিলোচন শাকসেনা। ওরা ঘণ্টা দুয়েক আগেই পেঁছাত পারতো। যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় জীপ মাঝ পথে আটকে গিয়েছিল। ঠিক করতে কিছু সময় গেছে।

ত্রিলোচন ড্রাইভার থাপাকে নিয়ে লোকের সন্ধান করতে গেল। জঙ্গল বিট করবার জন্য প্রয়োজন নেই। লোকের প্রয়োজন গোটা দুয়েক মাচা তৈরী করে দেওয়ার জন্য। জীপ থেকে নেমে সোমনাথ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাওবাব, শাল আর দেওদার গাছের সমারোহ। তাছাড়া এদের সঙ্গে মিলে মিশে রাজ্যের আগাছা জঙ্গলকে নিবিড় করে তুলেছে।

—কেমন দেখছো? বিকাশ প্রশ্ন করল।

—ভয়াবহ জঙ্গল। হিংস্র জন্তুদের বাস করার উপযুক্ত জায়গা।

—কত কাঠুরেকে যে বাঘে খেয়েছে তার ঠিক নেই। তবু লোকে কাঠ কাটতে এখানে আসে।

অল্প হেসে সোমনাথ বলল, কাঠ কেটে রোজগার করার আশায় লোকে প্রাণ হাতে করেই এখানে আসে।

—দাদাও ওই কথা বলেন। কাজে ইন্দোর গেছেন, নইলে তিনিও আসতেন আমাদের সঙ্গে এখানে। শিকারে দাদার উৎসাহ খুবই।

কথায় কথায় ঘণ্টাখানেক কাটল।

ত্রিলোচন জন চারেক লোক ও দড়িদড়া সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। এরাই মাচা বাঁধবে। তাদের নির্দেশ মত সকলে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলল। এই সমস্ত স্থানীয় লোকেরা জানে কোথায় মাচা বাঁধলে জঙ্গল বিট না করে বা প্রলোভন না দেখিয়ে জন্তুদের সাক্ষাত

সহজেই পাওয়া যাবে।

জীপ জঙ্গলের বাইরে রইল। জীপ পাহারা দেবার জন্য রয়ে গেল থাপা।

মাইল দেড়েক যাবার পর একটি জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। কোন নদী নয়। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জমি বসে গিয়েছিল বোধহয়। পাহাড়ী নদীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাওয়ায় জল এসে জমেছে এখানে। ছোটখাট হ্রদে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

জল শান্ত। নিস্তরঙ্গ।

জলের কাছাকাছি, সুবিধা মত জায়গায় বড় করে মাচা বাঁধা হল। কাজ শেষ করতে লাগল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। তারা বলল, এখানে জন্তুরা জল খেতে আসে, মারতে কোন অসুবিধা হবে না। সোমনাথ লক্ষ্য করল, ভেজা মাটি উপর বাঘ ও অন্যান্য জন্তুর পায়ের অজস্র ছাপ রয়েছে।

বেলা পড়ে এল।

ধূসর সন্ধ্যা ছেয়ে গেল চতুর্দিকে। সোমনাথ, বিকাশ ও ত্রিলোচন মাচায় উঠে বসল। কুলীগুলো আগেই বিদায় নিয়েছিল। খিদে পেয়ে গিয়েছিল তিনজনেরই। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছে। খিদের আর দোষ কি! তাছাড়া আলো থাকতে থাকতেই ও পর্ব শেষ করে নেওয়া ভাল।

টিফির কেরিয়ার দুটো সঙ্গেই ছিল। মিসেস চৌধুরী অনেক রকম খাবার-দাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। ভাগ করে, তিনজন অল্প সময়ের মধ্যেই খাওয়া শেষ করল। এখন অপেক্ষার পালা। শিকার করতে এই হল সবচেয়ে বিরক্তিকর অধ্যায়। কোন্ জন্তুর কখন তেষ্টা পাবে তার ঠিক নেই। আবার যে কোন জন্তু যে জল খেতে এলেই তাকে মারতে হবে এমন কথা নেই।

জন্তু বিশেষ চাই।

জঙ্গলে সন্ধ্যার আয়ু কম। রাত্রি নামে অত্যন্ত দ্রুত।

সাতটা বাজল।

চারিদিকের মসীকৃষ্ণ অন্ধকার লক্ষ্য করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এখন বুঝিবা মধ্যরাত্রি। মশা ছেয়ে গেছে। ফলাও ফলারের সুযোগ পেয়ে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুটেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তিনজন। কিন্তু স্থান ত্যাগ করার উপায় নেই। নির্বিকার-ভাবে বসে থেকে মশার অত্যাচার সহ্য করতে হবে। এক সময় বিকাশ ফিসফিস করে বলল, গায়ে কেরোসিন তেল মেখে এলে ভাল হত।

সোমনাথ বলল, কেরোসিন তেলের বর্ম গায়ে আঁটলেও এ মশার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত বলে আমি বিশ্বাস করি না। উঃ, কি রক্তই টানছে! পাউণ্ডখানেক বোধহয় ওজনে কমে গেছি।

সময় কেটে চলল।

সোমনাথ নিজের রেডিয়াম ডায়ালযুক্ত ঘড়িতে দেখল, একটা বেজে গেছে। ইতিমধ্যে গুলি ছুঁড়ে বাঘকে সতর্ক করে দেওয়া নিরর্থক বিবেচনা করে ওরা অনেক জন্তুকে উপেক্ষা করল। আচমকা ত্রিলোচন ওদের ঠেলা দিল। সোমনাথ ও বিকাশ সতর্ক হয়ে বসল। উৎকট দুর্গন্ধ নাকে আসছে।

শিরায় শিরায় তরঙ্গ জাগল তিনজনের। বাঘ আসছে। দেখতে পাওয়া না গেলেও, শুকনো পাতা মাড়িয়ে সে যে আসছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। ভাঙ্গা চাঁদ আকাশের এক পাশে হেলে রয়েছে। হাল্কা আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে জল ও তার কাছাকাছি জায়গা। বন্দুক তুলে নিয়ে তিনজনে সেই দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল।

ঝোপের আওতা ছেড়ে জন্তুটা বেরিয়ে এল। দীর্ঘকায়, মধ্য-বয়স্ক। ওদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থানের দিকে একবার নিজের ভাঁটার মত চোখ দুটো তুলল। হয়তো গন্ধ পেয়ে থাকবে। তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবু সে হেলে-দুলে স্বাভাবিক চালে এগিয়ে চলল জলের দিকে।

এরপর সমস্ত কিছু ভণ্ডুল করে দিল বিকাশ। উত্তেজনার শেষ প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সে। এত বড় বাঘ তার রেঞ্জের মধ্যে আগে কখন পড়েনি। জলের কাছে পৌঁছবার আগে—মাচা থেকে বাঘের দূরত্ব যখন মাত্র হাত পনেরো, বিকাশ গুলি চালাল।

অত্যন্ত উত্তেজনার জন্য তার হাত নিশ্চয় কেঁপে গিয়েছিল। গুলি যথাস্থানে লাগল না। বাঘও নিশ্চয় সতর্ক ছিল, সে এক লাফে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

—বিকাশ, তুমি একি করলে? দ্রুত গলায় সোমনাথ বলল, ওকে নিশ্চিন্ত মনে জল খেতে দিতে। তারপর—

—বাঘটাকে দেখে আমি ভাই কেমন হয়ে গেলাম। হাত কাঁপছিল, বুঝতে পারিনি। ইস, এত কাছে পেয়েও মারতে পারলাম না!

ত্রিলোচন বলল, মাঝ থেকে আজ রাতটা নষ্ট হল। এ তল্লাটে আর কেউ আসবে না। বন্দুকের আওয়াজে সকলে সতর্ক হয়ে গেল।

জন্তু পাওয়া যাক আর নাই যাক, দিনের আলো ফোটবার আগে মাচা থেকে নামা চলবে না। তিনজনে বিমর্ষভাবে বসে মশার কামড় খেতে লাগল। ক্রমে তিনটে বেজে গেল। সাড়ে তিনটেও।

ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। বাঘের দেখা অবশ্য আর পাওয়া গেল না। তবে গোটা কুড়িক বড় সাইজের হরিণ ঝোপঝাড় ফুঁড়ে জলের কাছে এসে উপস্থিত হল। নড়ে-চড়ে বসল তিনজন!

বিকাশ চাপা গলায় বলল, আমি আর নয়। তোমরা দু'জন গুলি চালাও।

সব ক'টি হরিণ তখন পাড়ে ছিল না। গোটা ছয়-সাত নেমে পড়েছিল জলে। বয়সে তারা নবীন হবে। নিঃশঙ্ক চিত্তে জল তোলপাড় করে খেলা করছিল।

সময় নষ্ট করবার আর প্রয়োজন নেই।

দুটি বন্দুক একই সঙ্গে গর্জে উঠল।

আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হরিণকুল। তবে সকলে যেতে পারেনি। ভিজে মাটির উপর পড়ে দুটি ছটফট করছে। গুলি লেগেছে তাদের। গুরুতর আহত হয়েছে, নইলে কোন রকমে ফিরে যেত।

দ্বিতীয়বার গুলি চালিয়ে জন্তু দুটিকে সম্পূর্ণ শান্ত করে দেওয়া হল। ঘণ্টা দুয়েক আরো মশার কামড় খেল তিনজনে। ভোরের আলোর ইশারা পাবার পর ওরা মাচা থেকে নামল। হরিণ দেখে বাঘ মারার দুঃখ কিছু লাঘব হল। মাংসের পাহাড় বললে অত্যুক্তি হয় না। চমৎকার স্পটেড লোমে ভরা।

অনেক পরিশ্রমের পর হরিণ দুটিকে যখন জীপের কাছে টেনে আনা হল তখন আটটা বেজে গেছে। ত্রিলোচনের পরামর্শ অনুসারে লোক ডাকিয়ে ওখানেই চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হল। সমস্ত রাত জেগে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর অপেক্ষা না করে চামড়া ও মাংস নিয়ে তিনজন শহরের দিকে যাত্রা করল।

বিকাশ কিছু বিষণ্ণ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঘের কথা মনে পড়ছে থেকে থেকে।

হরিণের চামড়া নিয়ে কি করা যায় তারই আলোচনা চলছিল ড্রইংরুমে। মিসেস চৌধুরী ও অণিমা ছাড়া পাশের বাড়ির রাহাবাবুর স্ত্রীও রয়েছেন।

পলা কোথায় ছিল। ঘরে ঢুকে বলল, চামড়া দুটো আমি নেব বৌদি। ড্রইংরুমে পেতে রাখব।

অনিমা হেসে বলল, ড্রইংরুমে! সোমনাথের ড্রইংরুমে নাকি?

পলা আরক্ত হয়ে উঠল।

মিসেস চৌধুরী হাসলেন।

—বেশ তো, ওর ফুলশয্যার তত্ত্বে না হয় চামড়া দুটো দেওয়া হবে।

রাহা-গিন্নী প্রশ্ন করলেন, পলার বিয়ে কি স্থির হয়ে গেল দিদি?

—হ্যাঁ ভাই। বিকাশের বন্ধু সোমনাথ, তারই সঙ্গে। খুব ভাল ছেলে। এখন সকলের আশীর্বাদে চার হাত এক করে দিতে পারলে বাঁচি।

ওদিকে—

নিজের ঘরের জানলার সামনে চেয়ারে বসে চন্দনা উল বুনছিল। বুনছিল নতুন প্যাটার্নের মস্তুর একটা পুলওভার। আর কয়েক কাঁটা বুনলেই কাজ শেষ হয়। বিকাশ ঘরে এল। আড় চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে নিজের কাজ করে চলল চন্দনা।

বিকাশ আরেকটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কাল আমাদের থ্রিলিং হান্টিং হল।

—শুনলাম।

—কে বলল তোমায়?

বোনা একপাশে সরিয়ে রেখে চন্দনা বলল, কিছুক্ষণ আগে সোমনাথবাবু বলছিলেন।

—ও! অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল বুঝি?

—না, দু-চার কথা!

বিকাশ একটু চুপ করে থাকবার পর বলল, বৌদিকে একবার বলেছিলে না চামড়া দিয়ে কুশন্ না ব্যাগ, কি করতে চাও! ইচ্ছে করলে হরিণের একটা চামড়া নিতে পার—চমৎকার স্পটেড লোমে ভরা।

ইতস্ততঃ করে চন্দনা বলল, আর দরকার হবে না। সোমনাথবাবু আগেই—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিকাশ।

—দু-চার কথা নয়। অনেক কথাই হয়েছে দেখছি! শোন চন্দনা, তোমার সঙ্গে আমার পরিষ্কার কথা হওয়াই ভাল।

—বলুন—

—আমি চাই না, সোমনাথের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করবার

চেষ্টা কর।

চন্দনা আশ্চর্য হল।

বলল মৃদু গলায়, আমি আপনাদের এখানে কাজ করি, আপনাদের মতের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য আমার নেই। যা বলবেন আমাকে শুনে চলতেই হবে।

—না, না, আমি কথাটা—

কথা শেষ হবার আগে ভৃত্য এসে দাঁড়াল।

—দাদাবাবু, আপনাকে এখুনি একবার সাহেব ডাকছেন।

বিকাশ চন্দনার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে এ মাসের 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পড়ছিল সোমনাথ। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। নভেম্বর মাসের অর্ধেক হতে চলল, এখনও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি।

চন্দনা ঘরে এল।

সোমনাথ চোখ তুলে বলল, কি সৌভাগ্য, আপনি!

—একটা কথা বলতে এলাম।

সোমনাথ উঠে বসে বলল, আপনাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। বসুন!

চন্দনা একটা চেয়ারে বসে বলল, কথাটা বলার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে···

—আপনি কি বলতে চাইছেন অনুমান করেছি। আমার মনে হয়, ও সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারকে মূল্য না দেওয়াই ভাল।

—ব্যাপারটা হয়তো তুচ্ছ কিন্তু আমার মূল্য না দিয়ে উপায় নেই, কারণ আমি এঁদের বাড়ি চাকরি করি। তা ছাড়া একটা হরিণের চামড়ার জন্য আপনার ও পলার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক আমি চাই না।

সোমনাথ হাসল একটু।

—ভুল বোঝাবুঝি!

—আমি টিকই বলছি।

—ও কথা যেতে দিন। আসুন না, একটু গল্প করি! আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে আপনার আগ্রহ হয় না?

—আগ্রহ? কিন্তু—

—আগ্রহ জানাতে সঙ্কোচ হয়, এই তো। আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জেনে নিয়েছি।

—জেনে নিয়ে কি দেখলেন?

—কি দেখলাম? দেখলাম, আমি যা চাই তার কোথাও ব্যতিক্রম নেই। ঠিক তেমনি—হুবহু।

চন্দনা দৃষ্টি নত করে বলল, আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

সোমনাথ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

—ছোটবেলা থেকেই আমি বেপরোয়া। অভাব ছিল না, নিজের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছি ইচ্ছামত। তবু একটা অভাব আমার থেকেই গেছে। চেষ্টা করেও আমি তা সংগ্রহ করতে পারিনি।

—কি সে জিনিস সোমনাথবাবু?

—সঙ্গী। মনের মত একজন সঙ্গী। কত রকম সমাজে আনাগোনা করলাম। কতই দেখলাম, কিন্তু আমি যাকে চাই তাকে খুঁজে পাইনি। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি যেন—

—আমি এবার যাই সোমনাথবাবু। এ ঘরে আমার উপস্থিতি আপনারও ক্ষতি করতে পারে।

—কথা এখনও শেষ হয়নি আমার!

—জানি। তবু আমি আর অপেক্ষা করব না। ক্ষমা করবেন।

কথা শেষ করে চন্দনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পলা ঘরে এল সেই সময়। অবাক হয়ে তাকাল চন্দনার দিকে, সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পলা সোমনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

—চন্দনা এখানে কেন এসেছিল সমুদা?

সোমনাথ নির্লিপ্তভাবে বলল, গল্প করছিলাম আমরা। কথা-বার্তায় বেশ মেয়েটি।

পলার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল!

ও অস্থির গলায় বলল, প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে কথা কইতে ভালই লাগে। কিন্তু তুমি জান না কি সাংঘাতিক মেয়ে ও।

—তাই নাকি!

—তবে আর বলছি কি!

—তা হবে। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

—কাকে বুঝতে পারলে না হে?

বিকাশ ঘরে এল।

সোমনাথ বলল, মন্তুর গভর্ণেসের কথা হচ্ছিল।

—তার কথা হঠাৎ—

টেনে টেনে পলা বলল, এতক্ষণ যে তিনি সমুদার সঙ্গে গল্প জমিয়ে ছিলেন!

বিকাশ ভ্রূ কুচকাল।

—অত্যন্ত অন্যায়। ওকে রাখা হয়েছে মন্তুকে দেখাশুনা করবার জন্য, আমাদের গেষ্টদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য নয়।

—তুমি মিথ্যে রাগ করছো বিকাশ। তাঁর কোন দোষ নেই। আমি জোর করে কথা বলছিলাম—তিনজন রয়েছি। এস, কয়েক হাত রুমি খেলা যাক।

বিকাশ খাটে এসে বসল। পলা টেবিলের উপর থেকে তাসের প্যাকেট তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও গড়াল অনেক দূর।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়।

সমবেত হয়েছেন ড্রইং-রুমে তিনজন। মিসেস চৌধুরী ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলছেন, ছি ছি, সোমনাথ কি মনে করল কে জানে! এইভাবে গায়ে পড়ে আলাপ করা! আমি তখনই ওঁকে বলেছিলাম, অনাথ

আশ্রম না কোথায় মানুষ হয়েছে, ওকে বাড়িতে ঢুকিও না। শুনলেন না—তুই তখন কিছু বলতে পারলি না ? পলা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি আবার কি বলব ! আমার কথা ও কেয়ার করে নাকি ?

অণিমা বলল, ওকে কিছু বলবেন নাকি মা ?

—হ্যাঁ, বলতে হবে বইকি ! কড়া করে ধমকে দিতে হবে। কি অনাছিষ্টি কাণ্ড ! আমার বাড়িতে শেষ পর্যন্ত—। এ সমস্ত বেহায়াপনাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না।

চন্দনা ঘরে এল।

মৃদু গলায় বলল, আমায় ডেকেছিলেন ?

আপাদমস্তক ওকে একবার দেখে নিয়ে মিসেস চৌধুরী গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যাঁ। এ সমস্ত কি শুনছি ? তুমি যে ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ !

—আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

পলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—ন্যাকামি করতে হবে না। কিছুই যেন জানে না !

মিসেস চৌধুরী বললেন, সোমনাথের সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে ?

—আমি······

—উপর-পড়া হয়ে তার সঙ্গে তুমি কথাবার্তা বলবার চেষ্টা কর, আমি পছন্দ করি না। ছি ছি, সে কি ভাবছে বল তো !

চন্দনা অপমানে লাল হয়ে উঠল।

—এ আপনি কি বলছেন ?

—ঠিকই বলছি। আমার বাড়িতে থাকবে, আমার খাবে আর আমারই বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে !

চন্দনা নিজের মনকে দৃঢ় করল।

এ কথার প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু করব না ! তাতে কোন লাভ হবে না। এখন বলুন, কি বলতে চাইছেন ?

দেখো বাছা, তোমার ওই ক্যাঁটক্যাঁটে কথাগুলো অসহ্য লাগে। আমি চাই, সোমনাথ যে ক'দিন আছে তার কাছ থেকে দূরে দূরে

থাকবে।

—তার দরকার হবে না। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

সকলে বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে।

—চলে যাচ্ছ !!!

—আমি এখানে আসা অবধি আপনারা আমাকে অনেকভাবে অপমান করেছেন। আমি সয়ে গেছি। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারের পর আমার আর এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

সশ্লেষে পলা বলল, এতই যদি তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, তাহলে পরের বাড়িতে চাকরি করতে এসেছিলে কেন ?

—তখন আমি বুঝতে পারিনি, আপনাদের বাড়িতে চাকরি করতে এলে আত্মমর্যাদাবোধটা অন্য কোথাও রেখে আসতে হবে।

মিসেস চৌধুরী গলা ছাড়লেন, খুব তো চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি আওড়াচ্ছ ! যাবে কোথায়, শুনি ? ছিলে তো অনাথ আশ্রমে, সেখানেই নাকি ?

—বরদার এক স্কুলে চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। আজই চিঠি এসেছে।

—যাচ্ছ, যাও। আমাদের আর কি বলবার থাকতে পারে। তবে এখানে এই কেলেঙ্কারীটা না করে গেলেই ভাল করতে।

চন্দনা আর কিছু বলল না।

ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বিকাশ ক্লাব থেকে ফিরছিল। তার সঙ্গে সোমনাথ ছিল না। সোমনাথ একাই বেরিয়েছিল। বাগানের গেট পার হতেই বিকাশ লক্ষ্য করল, স্যুটকেশ হাতে চন্দনা এগিয়ে আসছে।

বিকাশ সবিস্ময়ে বলল, কোথায় চলেছো ?

—ফ্রণ্টিয়ার মেল ধরতে।

—ফ্রণ্টিয়ার মেল ! কেন ?

—বরদা যাচ্ছি।

—বরদা যাচ্ছ! হঠাৎ—

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। মিঃ চৌধুরী কোথায় বেরিয়েছেন। এই চিঠিটা তাঁকে দিয়ে দেবেন দয়া করে।

ভাঁজ করা কাগজ চন্দনা বিকাশের হাতে দিল।

—আমার রেজিগনেশন লেটার।

—তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ভেতরে যান, সমস্ত বুঝতে পারবেন! আচ্ছা, নমস্কার।

চন্দনা গেট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

বিমূঢ় বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

সোমনাথ ফিরে এল মিনিট কয়েক পরেই। আজ অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। লক্ষ্য করল আগেকার দেখা ভূপাল ও আজকের ভূপালের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতালের।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে ড্রইংরুম পেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে উত্তেজিত কথাবার্তা এবং তার নাম বারংবার উচ্চারিত হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ শুনল একাগ্র মনে। তারপর দ্রুত পায়ে উপরে উঠে গেল সোমনাথ।

মিনিট দশেক কেটেছে বোধহয়।

সোমনাথ নিজের সুটকেশ হাতে নিয়ে নেমে এল। বেডিং সঙ্গে নিয়ে যাবার ঝামেলা পোহাতে চাইল না। থাক এখানে। নীচে নেমে এসে ড্রইংরুমের দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল।

স্বাভাবিক গলায় বলল, বিকাশ, আমি ভাই চললাম।

বিস্মিত বিকাশ বলল, সে কি!

—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ একটা মনে পড়ে গেল। না গেলেই নয়।

মিসেস চৌধুরী ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, চলে যাবে কি রকম এই তো সবে এলে! কিছুদিন থাক, বেড়াও, তারপর তো—

—আমি উপায়হীন। আমার পক্ষে অপেক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। পরে আসব। থেকে যাব কিছুদিন।

সোমনাথ হেঁট হয়ে মিসেস চৌধুরীর পদধূলি নিল। কাউকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

বিরাট এক সরীসৃপের মত স্টেশনে দাঁড়িয়ে তখন ফ্রণ্টিয়ার মেল ফুঁসছে। নির্জন লেডিস কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে বসেছে চন্দনা। আজ যে ঘটনা ঘটল, তার জীবনে এমন ওঠা-পড়া নতুন নয়। এই রকমই অপমান আর বিদ্রূপ সয়ে এসেছে সে আবহমান। শুধু মন্তুর কথা বার বার মনে পড়ছে। আকুল হয়ে ফুলের মত নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটি তাকে খুঁজবে।

ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠল চন্দনার মন।

না, আর ও সমস্ত কথা ভাববে না। কি হবে ভেবে? যা পেছনে ফেলে এসেছে তা স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাক। উপেক্ষা আর অবজ্ঞা সহ্য করার জন্য যে দুনিয়ায় এসেছে, সে কেন তার মায়া-মমতার বন্ধনে বাঁধা পড়বে? মনকে অন্য ধারে নিয়ে যাবার জন সুটকেশ থেকে একটা বই বার করে তাতে মনোনিবেশ করল।

—চন্দনা—

চমকে মুখ তুলল চন্দনা।

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমনাথ।

—আপনি।

—চলে এলাম।

—একি করলেন সোমনাথবাবু? এতে যে লজ্জা আরও বাড়বে।

সহাস্য সোমনাথ বলল, বরং লজ্জাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়? সত্যি এতদিন ধরে আমি যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি।

চন্দনা মাথা নত করল।

—প্রথম দিন সেই জলে ভেজা রাত্রে তোমাকে দেখেই কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, এতদিন আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। বল চন্দনা, তুমি কি আমার হয়ে থাকবে?

—কিন্তু আমি……আমি যে…

—তুমি যাই হও, আমার তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। শুধু আমার কথার উত্তর দাও—

চন্দনা নত মুখেই বসে রইল।

গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। আর্তরব তুলে দুলে উঠল ট্রেন।

—চুপ করে রইলে যে? কিছুই বলবে না?

মুখ তুলল চন্দনা। অস্ফুট গলায় বলল, এরকম বেপরোয়া লোককে নির্ভর করা কি ঠিক হবে?

জোরে হেসে উঠল সোমনাথ। ওর পাশে বসে ওকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

—বেপরোয়া লোকটি না হয় এবার থেকে তোমাকে পরোয়া করে চলবে! তাহলে আপত্তি নেই নিশ্চয়?

একবার সোমনাথের দিকে মুখ তুলেই মুখ নত করল চন্দনা। ডাউন ফ্রন্টিয়ার মেল তখন গতি নিয়েছে।

তিন

ডাউন বম্বে মেল যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে।

রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকাল সুব্রত। ছ'টা বেজে দশ। চা-এর জন্য মন আনচান করছে। ফ্লাস্কে আর চা নেই। ধানবাদ না আসা পর্যন্ত চায়ের পিপাসা মিটিয়ে নেবার কোন উপায় নেই।

শীতের সকাল।

জানালায় ফেলা পুরু কাচের বাইরে থেকে একটানা যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে। এলাহাবাদ যখন অতিক্রম করছে মেল তখন নব্বুই মিনিটের ওপর লেট রান করছিল। এখন অবশ্য রাইট টাইমেই চলেছে।

সুব্রত ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরছে। কৃষি-বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দু'বছর আগে ওখানে গিয়েছিল। পড়া ছেড়ে দেবার বেশ কিছুদিন পরে আবার নতুন করে পড়ায় মন বসাতে পারবে কিনা এ বিষয়ে সুব্রতর প্রচুর সন্দেহ ছিল। কার্যক্ষেত্রে নামবার পর কিন্তু দেখা গেল তার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। যোগ্যতার সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের পাঠ্যজীবনের ওপর যবনিকা ফেলেছে।

ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরার সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করেছে আমেরিকান এক্সপ্রেস। প্লেনে ফেরবারই ইচ্ছে ছিল। খরচ বেশি লাগলেও, সময় বাঁচানো যেত অনেক। কিন্তু চিঠি লিখে মা বিশেষ-ভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন প্লেনে ফিরতে। আজকাল ভীষণ অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে। অকালে তিনি নিজের একটি মাত্র ছেলেকে মোটেই হারাতে চান না।

সুব্রত মার চিঠি পড়ে হেসেছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু যদি থাকে, প্লেনে না চড়লেও তাকে এড়ানো যাবে না। বাথরুমে আছাড় খেয়ে পড়েও তো কত লোক মরছে। উত্তর দেবার সময় এত যুক্তিতর্কের কথা মাকে লেখেনি সুব্রত। ট্রেনে ইটালীর জেনওয়া পর্যন্ত

এসেছে। জাহাজে চেপে আলেকজোন্দ্রিয়া ছুঁয়ে বম্বে এসে পেঁীছেছে। মাকে অকারণে চিন্তিত করে রেখে লাভ কি ?

বম্বেতে সুব্রতকে উপায়হীন অবস্থায় দু'দিন থাকতে হয়েছে। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। দেখা বম্বেকে আবার ঘুরে-ফিরে দেখেছে। তারপর—ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুব্রত।

কি ভাবছেন এত মিঃ ব্যানার্জী ?

সুব্রত মুখ তুলল। অমিতাভ চৌধুরী নিজের বার্থে বসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেম্ব্রিজে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছিল অমিতাভ। একই জাহাজে বম্বেতে ফিরেছে দুজনে এবং একই ট্রেনে, একই কামরায় ফিরে চলেছে কলকাতা। অমিতাভ উঠে এল তার কাছে।

স্টেশনে কে কে রিসিভ করতে আসবে সেই কথাই ভাবছেন বুঝি ?

সুব্রত হাসল।

আপনাকে রিসিভ করতে অনেকেই আসছেন বোধহয় ?

আর বলবেন না, সে এক ব্যাটেলিয়ান। বাড়ীর লোক বাদ দিয়ে ধরুন মিমি—আই মিন আমার ভাবী-স্ত্রী, তারপর ওর মা। এছাড়া মিমির বান্ধবীরা তো আছেই।

আপনি ভাগ্যবান মিঃ চৌধুরী। আপনার জন্য এতগুলো লোক হাওড়া স্টেশনে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে এও তো কম কথা নয় !

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে অমিতাভ বলল, তা বলতে পারেন। এই ধরুন না কেন, আমার কি বিলেত যাওয়া হত ? কখনই না। মিসেস ঘোষ চৌধুরী—আই মিন মিমির মার ইচ্ছেতেই তো—আপনিই বলুন না, ভাবী-জামাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে ক'জন তাকায় ?

বটেই তো। সুব্রত সিগারেট ধরাল। ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে ভাল করলেন। ভাবী-শাশুড়ীর কথাও রাখলেন আবার নিজের ভবিষ্যৎও গুছিয়ে নেওয়া হল।

না গিয়ে কি উপায় ছিল ? সে এক কাহিনী বলতে পারেন। অনেক কসরৎ করবার পর মিমির মন যদি বা পেলাম, ওর মা বেঁকে বসলেন। ব্যারিস্টার ছাড়া জামাই করবেন না। কি আর করি। একদিন ভেসে পড়তে হল। যাবার দিন মিমির সে কি কান্না !

পরিণয়-পর্বটা বোধহয় এ মাসেই সেরে ফেলবেন ?

দেখি ! ইংল্যান্ড খাসা জায়গা, কি বলেন মিঃ ব্যানার্জী ? আমার তো আসতে ইচ্ছে করছিল না। অবশ্য লিজার সঙ্গে পরিচয় না হলে এ রকমটা হত না।

লিজা ! মানে....ওখানেও...

সলজ্জ হেসে অমিতাভ বলল, প্রেম হল একটা ট্র্যাপ, মানুষ ওতে ধরা পড়বেই। অবশ্য প্রথমে আমি তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওরকম মিষ্টি মুখকে কতক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা যায়, বলুন ? সে যাক, এবার আপনার কথা কিছু বলুন ?

কি আর বলব ! আমি যেন নিতান্তই ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলাম। ওখানে কোন রোমাণ্টিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়িনি। রিসিভ করতেও স্টেশনে আমার কেউ আসবে না। আসবার মত কে-ই বা আছে, কলকাতা থেকে তিনশ' মাইল দূরে বিহারের এক শহরে মা থাকেন। কাকা আছেন অবশ্য। কলকাতাতেই থাকেন। তাঁর আবার আমার সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

কামরায় আর দুজন যাত্রী তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। সিগারেট আগেই পুড়ে ছাই হয়েছিল। আরেকটা ধরিয়ে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

খুব ভোরে মণিকার ঘুম ভাঙল !

সারা রাত্রি যে খুব ভাল ঘুম হয়েছে তাও নয়। বলতে গেলে আধো ঘুমের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে রাত। এ রকম কখনও হয়

না, এই প্রথম। বিরাট একটা কারণ যে বর্তমানে নেই তা নয়, আজ সুব্রত ফিরছে।

দীর্ঘ দু'বছর পরে ও ফিরে আসছে কলকাতায়।

বিছানায় খানিক এপাশ-ওপাশ করে মণিকা উঠে পড়ল। আড়ামোড়া ভাঙল, শাড়ি ঠিক করে নিল। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চোখ তুলতেই দেখল, এখন সবে সাড়ে পাঁচটা। ক'টায় বম্বে মেল ইন করে যেন হাওড়ায় ? এগারটায় বোধহয়। উঃ, এখনও কত দেরী !

মণিকা বিছানার কাছ থেকে সরে এসে জানালার সামনে দাঁড়াল। জনপরিপূর্ণ রাস্তা এখন কেমন সম্পূর্ণ নির্জন। দু' চারটে কাক নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে শুধু লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। মণিকা ঘরের বাইরে এল। মা বাবা এখনও কেউ ওঠেননি। দেবু, রেবু—ওরাও ঘুমচ্ছে।

ও দেবুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

দেবু—এই দেবু—ওঠ—

উঁ....।

মণিকা এবার ওকে একটা ধাক্কা দিল।

এই দেবু—ওঠ ভাই—

দেবু চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বলল, কি বলছ মেজদি ?

তোর কারখানায় গিয়ে আজ আর কাজ নেই। এখুনি একবার বৈঠকখানা বাজারে চলে যা।

বৈঠকখানা বাজার !

কাল তোকে বললাম না, ফর্দ মিলিয়ে ওখান থেকে জিনিস কিনে আনতে হবে !

ও হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? সুব্রতদা আসবেন সেই কোন্ বেলায়। তা ছাড়া এখন বাজার খোলেনি।

ছোট ভাইয়ের কথায় মণিকা লজ্জিত হল।

ব্যস্ত আবার কোথায় দেখলি ? ফর্দ আর টাকা টেবিলের ওপর

রাখা আছে, যাবার সময় নিয়ে যাস।

সুব্রত আসছে, ব্যস্ত হবে না মণিকা!

এই সংকীর্ণ ঘর দুটোর মধ্যে ওকে এনে তুলতে সংকোচ হয়েছে মণিকার। সুব্রতর যে কিছু অজ্ঞাত তা নয়, তবু সংকোচকে জয় করতে পারেনি। হোটেল কণ্টিনেণ্টালে একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছে। অবশ্য এবেলা খাওয়া-দাওয়া এখানেই সারবে। কি কি খেতে ভালবাসত সুব্রত, একে একে মনে পড়ে গেছে মণিকার। মা ভার নিয়েছেন সেগুলো রাঁধবার, কাজেই ওবিষয়ে ওর দুশ্চিন্তা নেই।

দুটো বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজকের এই ক' ঘণ্টা আর কাটতে চাইছে না। প্রতীক্ষার সঙ্গে একটা অজানা পুলক সারা মনকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছে। ফেলে-আসা দিনের কত কথা মনে আসা-যাওয়া করছে। পরিচয়ের সেই প্রথম মুহূর্ত কেন আজ বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে কে জানে?

তবে মাঝে মাঝে একটা আশংকাও মনকে যে দোলা না দিয়ে যাচ্ছে, তা নয়। সুব্রত কি একলা ফিরে আসছে? সঙ্গে যদি এক শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে এসে থাকে! কোন্ অধিকারে এর প্রতিবাদ করবে মণিকা? বিগত দিনের ঘটনাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই ওই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ঘরে ফিরে এসে নিজের বিছানায় মণিকা বসল।

নতুন করে ও পুরানো দিনের কথা ভাবতে আরম্ভ করল। সেদিন ও আর কিছু বলতে চায়নি, বোঝাতে চেয়েছিল শুধু নিজের দায়িত্ব বোধের গুরুত্ব। কিন্তু সেদিন সুব্রত ওর অক্ষমতার নেপথ্য কাহিনীকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়নি। কেন? কেন সে সেদিন এত নির্মম হয়ে উঠেছিল? আজ দুবছর ধরে গুমরে গুমরে তাই কি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না মণিকার মন? ও ভাবতে থাকে—সেদিনের সকাল ঠিক আজকের মতই পরিচ্ছন্ন রূপে দেখা দিয়েছিল। মণিকার ব্যস্ততার সীমা ছিল না। অনেক জায়গায় আবেদন

পাঠাবার পর এই প্রথম বার ইণ্টারভিউ-এ যোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছে আজ। পরিচ্ছন্ন সাজ-পোশাক পরে কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুল মণিকা। কলকাতার পথে-ঘাটে একলা চলা-ফেরা করবার অভ্যাস আছে, কাজেই ডালহাউসিতে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পেঁছিতে অসুবিধা হবে না।

ইণ্টারভিউ সেরে মণিকা যখন বেরুল তখন একটা বাজে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। চাকরিটা হবে বলে তো মনে হয় না! ত্রিশটি পদের জন্য আবেদন করেছে পাঁচশ' জন। অবশ্য ইণ্টারভিউ ভালই দিয়েছে মণিকা। আজকের দিনে ধরাধরি না করলে কিছু হয় না। খাঁটির জোর থাকা চাই।

এবার ওকে এক খুঁটির সন্ধানে যেতে হবে। ব্যানার্জী অ্যাণ্ড রে কম্পানীতে ওর বাবার একজন বাল্যবন্ধু আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। টেলিফোন বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম আছে। তিনি বলেছিলেন, ইণ্টারভিউ দেবার পর তাঁকে মনে করিয়ে দিলে, নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন।

নেতাজী সুভাষ রোড ধরে মণিকা এগিয়ে চলল। নম্বরের ওপর চোখ রাখতে ভুলল না। ফেয়ারলী প্লেস অতিক্রম করে যাবার পর—ওই তো, বোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে—ব্যানার্জী অ্যাণ্ড রে প্রাইভেট লিঃ। জেনারেল মার্চেণ্ট অ্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।

ছোট অফিস।

মণিকা কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল। চমৎকার ছিমছাম পরিবেশ। চারিদিকে কর্মব্যস্ততা। ও ইতস্ততঃ করতে লাগল। কার কাছে খোঁজ নেয় সেটাই হল এখন সমস্যা। ওকে কেউ দেখেও দেখছে না। এই সময় বাঁ পাশের সুইং ডোর ঠেলে একজন বেরিয়ে এলেন।

মণিকা দেখল ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের মধ্যেই। বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, স্মার্ট চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত, আকর্ষণীয় মুখ। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। ভদ্রলোক ওকে পাশ কাটিয়ে, পা এগিয়ে গিয়ে থামলেন। ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, কাউকে কি খুঁজছেন?

হ্যাঁ। শৈলেন রায়ের সঙ্গে দেখা করতাম।

তিনি তো উপস্থিত অফিসে নেই। ব্যবসাগত কথাবার্তা যদি কিছু থাকে আমায় বলতে পারেন। আমি সুব্রত ব্যানার্জী, কম্পানীর একজন ডিরেক্টার।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল।

আপনাকে তাহলে কাল আসতে হবে। উনি আজ আর ফিরবেন না।

মণিকা আর কিছু বলল না। বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

পরের দিন মণিকা আড়াইটার পর গেল ব্যানার্জী অ্যান্ড রে'তে।

সৌভাগ্যক্রমে শৈলেনবাবু ছিলেন। কথাবার্তা হল। সেই পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আজই দেখা করবেন জানালেন তিনি। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার মুখে আজও দেখা হয়ে গেল মণিকার সঙ্গে সুব্রতর।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল সুব্রত।—দেখা হল?

মণিকা চমকে উঠল। সুব্রত আজও ওর সঙ্গে কথা বলতে পারে, ও কল্পনা করতে পারেনি তা। বড়লোকের খেয়াল।

হ্যাঁ।

কি বললেন উনি?

মণিকা এবার বিরক্ত হল। এ কি ধরনের ভদ্রতা? তবুও ভদ্রতা বজায় রেখে বলল, পরে আসতে বললেন। আমার কাজটা উনি করে রাখবেন।

সুব্রত ঘন ঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়ে বলল, আপনি যে কাজে মিঃ রায়ের কাছে এসেছেন এখন তা সফল হবে না। কারণ টেলিফোনের মিঃ দোস্তিদার দিল্লী বদলী হয়ে গেছেন।

সবিস্ময়ে মণিকা বলল, আপনি আমার বিষয় জানলেন কিভাবে?

আপনার কথা মিঃ রায়কে বলেছিলাম। উনি আমায় আপনার

চাকরির কথাটা বললেন।

তবে যে উনি বললেন, মিঃ দোস্তিদারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন?

বিচিত্র হাসিতে মুখ রাঙিয়ে সুব্রত বলল, ও রকম বলতে হয়। উনি এখুনি আপনার আশা-ভঙ্গের কারণ হতে চাইছেন না আর কি!

মণিকার মুখের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল। ক্ষীণ আশা ছিল, ওর দেওয়া ভাল ইণ্টারভিউ আর শৈলেনবাবুর চেষ্টায় চাকরিটা হয়ে যাবে। আজ বছরখানেক ধরে একটা চাকরির জন্য কি চেষ্টাই না করছে। আর মাস ছয়েক পরে বাবার পেন্সন হয়ে যাবে, তখন যাতে সংসার অচল না হয়ে পড়ে তার জন্যই তো মণিকার এই পরিশ্রম। কিন্তু পরিশ্রম তো সার্থক হচ্ছে না!

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সুব্রত বলল, আমি কি কিছু বেফাঁস বলে ফেললাম?

না, না। আমার খুব আশা ছিল, কাজটা···মণিকা কথা শেষ করতে পারল না। কেঁপে গেল গলা।

আপনার কাজটা না হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কিন্তু আমি খুশি হয়েছি।

বিস্মিত হয়ে মণিকা বলল, আপনি খুশি হয়েছেন?

নির্বিকার গলায় সুব্রত বলল, আমাদের দেশে মেয়েদের আলতা, সিঁদুর আর ঘর-সংসারের কাজে যেমন সুন্দর মানায়, তেমনই বিশ্রী লাগে তাদের অফিসের আওতায়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, চাকরি করাটা আজকালকার মেয়েদের একটা ফ্যাশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

মণিকা হাসল। করুণ হাসি।—আপনি ভুল করছেন। ফ্যাশানের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য চাকরি আমার প্রয়োজন।

ও! ক্ষমা করবেন। আপনার পোশাক-আশাক দেখে ভেবেছিলাম···

সামর্থ্য না থাকলেও বাইরের চাকচিক্য আজকাল বজায় না

রাখলে চলে না।—আচ্ছা চলি, নমস্কার—। কথাটা শেষ করে মণিকা বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

ওই ঘটনার পর চারদিন অতিক্রম করে গেছে।

কলকাতার বুকে তখন জাফরাণী সন্ধ্যা। মণিকা দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। গিয়েছিল এক বান্ধবীর বাড়ি। মিনিট কুড়ি আগে ফিরে, সবে গা ধুয়ে কাপড় বদলাচ্ছে—দরজার কড়া নড়ে উঠল।

রেবু এই রেবু কোথায় যায় সব? তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিক করে নিয়ে ও দরজার দিকে এগুলো। বাবা নয় নিশ্চয়, উনি এত জোরে কড়া নাড়েন না। সন্তর্পণে খিলটা সরিয়ে দরজা খুলল।

নমস্কার!

একি, আপনি—! মণিকা অবাক হয়ে যায়। প্রতি-নমস্কার করবে কথা পর্যন্ত মনে থাকে না।

আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যাবার পরই মণিকা বিব্রত হল। সুব্রত এখানে এল কেন? ওর সঙ্গে কি এমন কথা থাকতে পারে? ভাল করে আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু সে-সব পরের কথা, এখন এই মান্যবর অতিথিকে বসাবে কোথায়? ঘরের এই তো ছিরি। ঘর না বলে একে গুদাম বলাই ভাল।

সুব্রত চৌকাঠের ওপর পা রেখে বলল, কি ভাবছেন?

না—ভাবছিলাম, আপনাকে বসতে বলা উচিত, কিন্তু ঘর দোরের যা অবস্থা—

এতে কুণ্ঠিত হবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আসুন না, ওই সামনের পার্কে গিয়ে বসি। ওখানেই কথা হবে!

মণিকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তাড়াতাড়ি চটিটা গলিয়ে নিয়ে, মাকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে নেমে আসে রাস্তায়। পার্ক জন-বিরল হয়ে এসেছে। ওরা গিয়ে বসল একটা বেঞ্চে।

সুব্রত বলল, মিঃ রায়ের কাছে আপনার ঠিকানা পেলাম। অবশ্য আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল, এই সময় আপনার দেখা পাব কি না!

কি বলবেন বলছিলেন?

মিঃ রায় বলছিলেন, মিঃ দোস্তিদার কলকাতাতে থাকলেও তাঁর পক্ষে আপনাকে কাজটা করে দেওয়া সম্ভব হত না। মিনিস্টারদের ক্যাণ্ডিডেট আছে অনেক।

ম্লান হেসে মণিকা বলল, ও চাকরির আশা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি। এই সামান্য কথাটুকু বলবার জন্য আপনি মিথ্যে কষ্ট করলেন।

আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি জানতে এসেছিলাম, একটা কাজের সন্ধান দিলে আপনি কি করবেন?

মণিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুব্রতর দিকে। আপনি···

হ্যাঁ, আমার আজকের ব্যবহারটা নিশ্চয় আপনার একটু গায়ে পড়া বলে মনে হচ্ছে। সেদিন আপনি চলে আসবার পরই আমার মনে হল আপনার জন্য বোধহয় কিছু করা উচিত। তাই—

মণিকা কিছু বলতে পারে না।

বিংলে অ্যান্ড ডবসনের নাম নিশ্চয় শুনেছেন? বিখ্যাত মার্কেণ্টাইল ফার্ম। ওখানে আমার এক বন্ধু বিশেষ দায়িত্বশীল পদে চাকরি করেন। তাঁকে বলেছিলুম আপনার কথা। একজন রিসেপসনিস্টের দরকার ওখানে। আপনি চান্স পেয়ে যাবেন।

বিংলে অ্যাণ্ড ডবসন কম্পানীতে চাকরি হবে! এ তো আমি ভাবতেও পারছি না।

এই রকমই হয়। সময় সময় এমনি কত অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমাদের সামনে এসে পড়ে যা আমরা ভাবতেও পারি না।

কৃতজ্ঞতায় সমস্ত শরীর মণিকার নুয়ে পড়ে। কি আশ্চর্য প্রকৃতির এই লোক! সত্যি কত অবিশ্বাস্য ব্যাপার সময় সময় বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। ও মুখ নীচু করে নম্র গলায় বলল, কিন্তু

আপনি এত কেন করবেন আমার জন্যে ?

করলামই বা ! আপনি কাল বারোটার পর আমার অফিসে আসবেন, সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে যাব।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। তবে যে উপকার করলেন তার জন্য আজীবন ঋণী থাকব।

সুব্রত হাসল।

কাজ হয়ে যাবার পর, মাইনে পেলে একদিন খাইয়ে দেবেন, ঋণের বোঝা তাহলে কিছু হাল্কা হয়ে যেতে পারে।

মেজদি—মেজদি—

চটকা ভাঙল মণিকার।

রেবু ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা এখানে বসে বসে ভাবছে। মুখ তুলে বলল, কি বলছিস ?

মা তোমায় ডাকছেন।

মণিকা একটা হাই তুলে বারান্দার দিকে এগুলো।

মিনিট দশেক আগে ধানবাদ অতিক্রম করেছে মেল।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়েছে সুব্রত। আগাথা ক্রিস্টির একটা উপন্যাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। পড়তে ভাল লাগছে না। মার কথা মনে পড়ছে। দু'বছরে আরো বুড়ো হয়ে গেছেন বোধহয় ! চুল আরো পেকে গেছে। অথচ বাহান্না বছর বয়সকে কি খুব বেশি বয়স বলা যায় ? সুব্রত কতবার বলেছে, আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোন রকম অসুবিধা যখন নেই তখন এত চিন্তা মনের মধ্যে জমিয়ে রেখে লাভ কি ? এই চিন্তা-ভাবনাই তো তোমাকে বুড়ো করে দিচ্ছে।

মা হেসে বলেছেন, বুড়িয়ে যাবার আর অপরাধ কি ? বয়স তো কম হল না ?

সুব্রত সিগারেট ধরাল।

ইংল্যান্ড রওনা হবার দিন তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল দেখা

যায়নি। কিন্তু কান্নায় যে বুক ফেটে যাচ্ছিল তা কি বুঝতে পারেনি সুব্রত ? ছেলের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে এই সম্ভাবনা থাকায় নিজেকে শক্ত বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন তিনি।

বাবার কথা সুব্রতর ভাল করে মনে পড়ে না। জ্ঞান হয়ে অবধি সে শুধু মাকে দেখে আসছে। বড় হয়ে শুনেছে, বাবা বেপরোয়া ধরনের লোক ছিলেন। জীবনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন। মৃত্যুও এসেছিল ওই গতিবেগের পথ ধরে। মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন তিনি।

বাবার অভাব কিন্তু সুব্রত বুঝতে পারেনি। দুরন্ত ঝড়ে প্রায় ডুবন্ত নৌকোকে যেমন অভিজ্ঞ মাঝি রক্ষা করে, তেমনি শক্ত হাতে হাল ধরে সুব্রতকে ডুবতে দেননি মৃন্ময়ী। অবশ্য সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। প্রাচুর্যের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রকে ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিলেন স্বামী।

সুব্রত শুনেছে, সেই দুঃসময়ে মার পাশে সবচেয়ে আগে যাঁর গিয়ে দাঁড়াবার কথা, তিনি কাকা। কলকাতা থেকে চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করেননি। অথচ নিজের সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে কপর্দকশূন্য কাকা যখন বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি ছোট ভাইকে ব্যানার্জী অ্যাণ্ড রে'র অন্যতম অংশীদার করে নেন। তবুও পরবর্তীকালে মৃন্ময়ী দেওরের সঙ্গে ভাল সম্পর্কই বজায় রেখে চলেছেন। ছেলেকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে যেন তার কাকার অন্যায় কাজের বিচারক না হয়ে ওঠে।

লেখাপড়ায় সুব্রত মোটামুটি ভালই ছিল।

সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হবার পর মা প্রশ্ন করলেন, এম. এস-সি না ইঞ্জিনীয়ারিং, কি পড়বার ইচ্ছে আছে এবার ?

মৃদু হেসে সুব্রত বলল, আবার পড়া ?

আর পড়বি না নাকি ?

বিদ্যার বোঝা আর আমি বইতে পারব না মাগো।

ছেলের কথায় মৃন্ময়ী হেসে ফেললেন। তা হলে কাজকর্ম করবি বল?

হ্যাঁ। সেই রকমই স্থির করেছি। কলকাতায় গিয়ে নিজেদের অফিসে যোগ দেব। কালই এ সম্পর্কে কাকাকে চিঠি দেব।

মৃন্ময়ী আর কিছু বললেন না। ছেলের যে কোন পরিকল্পনার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা আছে। দোষের মধ্যে অতিমাত্রায় খেয়ালী।

এক সপ্তাহ পরে কলকাতা থেকে উত্তর এল। কাকা লিখেছেন, এখন কলকাতায় এসে কাজে যোগ দেবার অর্থ হল নিজে ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করা। সুব্রত আরো কিছুদিন পড়াশুনা চালিয়ে যাক। তিনি সময় মত ওকে কাছে ঠিক ডেকে নেবেন।

সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে বার তিনেক চিঠিখানা পড়ল। বুঝতে কষ্ট হল না যে, কাকা চান না ও কলকাতায় আসুক। নইলে এ কথা তিনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতেন. ওখানে এম এস-সি পড়বার তো কোন সুবিধা নেই। কলকাতায় চলে এস। আমার কাছে থেকে পড়বে।

মাকে আর চিঠিখানা সুব্রত দেখাল না। উনি দ্বিধায় পড়ে যেতে পারেন। ভাল একটা দিন দেখে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেল।

কাকা শশাঙ্কমোহন পাম এভিনিউ-এ থাকেন। বিদেশী কেতায় তাঁর বাড়ি সাজানো। বিলাতে না গিয়েই তিনি পুরোপুরি সাহেব।

সুব্রত স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে পাম এভিনিউ-এ চলে এল। কাকার সঙ্গে দেখা হল পার্লারেই। গায়ে ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে, দাঁতে দিয়ে পাইপ চেপে তিনি খবর কাগজ পড়ছিলেন। ভাইপোকে দেখে বিশেষ খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। উঠে দাঁড়ালেন।

সুব্রত প্রণাম করল তাঁকে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শশাঙ্কমোহন বললেন, তোমাকে না এখন কলকাতা আসতে বারণ করেছিলাম! টাকা চেনবার দিন তো পড়েই আছে। এই বয়সে লেখাপড়া করতে হয়।

সুব্রতর ইচ্ছে করতে লাগল এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের ওপর রাগও হতে লাগল। ও কি জানত না, কি ধরনের সম্ভাষণ ওর জন্য এখানে অপেক্ষা করছে? স্টেশন থেকে সোজা কোন হোটেলে চলে যেতে পারতো। অনেক টাকাই তো সঙ্গে করে এনেছে বাড়ি থেকে।

সুব্রত যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলল, মুঙ্গেরে এম. এস-সি পড়বার কোন ব্যবস্থা নেই এ কথা তো আপনি জানেন। কলকাতা থেকে মাস্টার ডিগ্রী নিতে পারলেই তার কদর। তা ছাড়া পড়ায় আমার আর মন বসছে না।

বসাবার চেষ্টা কর।

আমি সোমবার থেকে অফিসে আসতে চাই।

শশাঙ্কমোহন এবার গলা নামিয়ে বললেন, ও কোন কাজের কথা নয়। তোমাকে ঘিরে দাদার অনেক স্বপ্ন ছিল। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ওঁর আত্মাকে কষ্ট দিও না।

তাঁর ইচ্ছেমত কাজই আমি করতে চাইছি। তাঁর উইলের নির্দেশ মত আমার আরো দু'বছর আগে ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। এখন আমি যাচ্ছি। সোমবার দিন অফিসে দেখা হবে।

যাচ্ছ মানে? তুমি এখানে থাকবে না?

এখানে থাকবার জন্যেই আমি এসেছিলাম কাকা। আপনি সে সুযোগ তো আমায় দিলেন না!

আমি দিলাম না! কি বলতে চাও?

রাত-ভোর ট্রেন জার্নির ধকল সয়ে এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন, তাতে এখানে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

শশাঙ্কমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কুড়ি বছর বয়সের ভাইপোর মুখ থেকে এত স্পষ্ট কথা তিনি কখনই আশা করেননি। সুব্রত তাঁকে কিছু বলার অবকাশও দিল না। কথা ক'টা শেষ

করেই ও নিজের স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বাগানে নেমে পড়ল।

বছর ছয়েক কেটে গেছে।

নিজেদের ব্যবসায়ে যোগ্যতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করে চলেছে সুব্রত। শশাঙ্কমোহন এখনও ভাইপোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। দাদা মারা যাবার পর দীর্ঘদিন এই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি। সুব্রতর আগমনে তাঁর আসন টলেছে। নানা পথ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে অজস্র টাকার কারচুপি করেছিলেন তাও ধীরে ধীরে জানাজানি হয়ে গেছে।

সুব্রত শুধু বলেছিল, টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে তা জানাজানি হয়ে যাবার ভয়েই কি আপনি আমায় আরো কিছু-দিন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলছিলেন?

শশাঙ্ক সেদিন আমতা আমতা করে বলেছিলেন, না, ঠিক তা নয়···তবে···আমার একটা প্রস্তাব আছে।

বলুন?

তোমার শেয়ারটা আমায় বিক্রী করে দাও না! ভাল দাম দেব।

সুব্রত জোরে হেসে উঠেছিল।

আপনার আর কোন সোর্স অব ইনকাম নেই। অথচ আপনি কোম্পানীর মেজর শেয়ার কিনতে চাইছেন! এতে প্রমাণ হচ্ছে না কি, আমার টাকা দিয়েই আপনি আমার শেয়ার কিনবেন? গুরুতর আর্থিক দুরবস্থায় আমি এখনও পড়িনি। যদিও কখনও সেদিন আসে আপনাকে জানাব।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুব্রত ভাবতে থাকে, মণিকার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ যে কোন উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে। ওর সুন্দর ভাসা-ভাসা চোখ দুটো প্রথম দর্শনেই তাকে বিমনা করে তুলেছিল। তারপর ঘোর কেটে গেলে সে কি প্রকাশ করেছিল চরম অস্থিরতা?

মণিকা তো একদিন প্রশ্নই করে বসল, আমি এখনও বুঝতে পারি না, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এত ব্যগ্র

হয়ে উঠেছিল কেন ?

সুব্রত হাসতে হাসতে বলল, আমার দোষ নেই। তুমিই তো আমায় বাধ্য করেছিলে।

আমি !

হ্যাঁ গো সখী ! পরিষ্কার করে বলতে হলে, তোমার ওই টানা টানা চোখ দুটো। ওরাই তো আমার সব এলোমেলো করে দিল। কবির মত আমারও মনে হল, কালো সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

মণিকাও হেসে ফেলল।

ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সুব্রত বলল, কেন, সায়েন্স পড়েছি বলে কি এতই নীরস আমি ? তুমি জান না, কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের মধ্যে কি অসাধারণ কাব্য লুকিয়ে আছে !

তা হলে কবিবর, তুমি তোমার ফিজিক্স মহাকাব্য নিয়েই থাক। আমাদের রবীন্দ্রনাথই ভাল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ওরা বসে আছে পাশাপাশি। জায়গাটা বেশ নির্জন। নির্জন বলেই ওরা ওখানে এসে বসেছে।

কাজ কেমন লাগছে ?

সুব্রতর আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মণিকা বলল, ভালই।

সহকর্মীরা কেমন ? ভাল ?

সকলেই বেশ ভাল। শুধু একজন একটু যেন কেমন কেমন।

হাসি মুখে সুব্রত বলল, তারও বোধ হয় আমারই মত ঘোর লেগেছে।

মণিকা গম্ভীর হবার ভান করে বলল, এত ঘোরের ছড়াছড়ি কেন বুঝি না।

বোঝ ঠিকই। না বোঝার ভান করা হল মেয়েদের একটা বৈশিষ্ট্য। চল, ওঠা যাক। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে শশাংকমোহন সুব্রতকে প্রীতির চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। এর কারণ প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। এখন অবশ্য সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সেদিন সুব্রত লাঞ্চে বেরুচ্ছে, শশাংকমোহন ডাকলেন, ওহে, শোন!

সুব্রত কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

উনি পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমার কাকিমা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তোমার জন্যে। তুমি একেবারেই যাও না। আমার কথায় কি রাগ করতে আছে? জান তো আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী। সময় সময় অকারণেই একটু চেঁচামেচি করে বসি।

সে জন্যে কিছু নয়। ঠিক আছে, আমি যাব।

যাব নয়, এখুনি যাবে। লাঞ্চ আমার সঙ্গে সারবে তুমি। তোমার কাকিমা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন।

সুব্রত বেশ অবাক হয়ে গেছে। তবুও তাঁর ইচ্ছাকেই মেনে নেয়। নতুন কেনা কাকার মাস্টার বুইকে চড়ে দুজনে লাঞ্চ সারতে পাম এভিনিউ চলে যায়। কাকিমা সমাদরে ওকে গ্রহণ করলেন। নানা রকম কথা হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাকিমাই আলাপ করিয়ে দিলেন বাসবীর সঙ্গে। শশাংকমোহনের ভায়রা-ভাই বিজয়রতন প্রতিষ্ঠিত কন্‌ট্রাক্টার। বাসবী তাঁরই মেয়ে। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে বসে আছে। চলনে-বলনে সম্পূর্ণ আধুনিকা। এই ভরা দুপুরে কোন মেয়ে এত হাই মেক-আপ করে বাড়িতে থাকতে পারে সুব্রতর ধারণা ছিল না। তবে মেক্‌-আপের বাইরেও যে মেয়েটি সুশ্রী তা সে বুঝতে পারে। সুব্রত ভাবতে থাকে, বাসবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই কি লাঞ্চের জন্য তাকে এখানে আনা হল?

আজ দু' বছর ধরে মা বিয়ের কথা বলছেন। দেখা হলে তো বটেই, চিঠিতেও বারংবার লিখছেন। সুব্রত এড়িয়ে যাচ্ছে। মাকে বলেছে কয়েকবার, এরই মধ্যে এত দায়িত্ব কেন চাপাতে চাইছ

আমার উপর? তিনি শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না দেখে কাকাকে এ সম্পর্কে লিখেছেন? তাই কি— ?

এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরে অফিসে একটা টেলিফোন পেয়ে একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল সুব্রত। টেলিফোন করছিলেন বাসবীর মা, মিসেস মুখার্জী। হ্যালো···কে, সুব্রত···আমি বাসবীর মা কথা বলছি···কয়েকদিন থেকেই তোমায় ফোন করব করব ভাবছিলাম···বাসবী তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আজ এস না আমাদের এখানে অফিস ফেরত—চা এখানেই খাবে—

আজ্ঞে—আজ আমার—

সঙ্কোচ করবার কিছু নেই—তুমি তো আমাদের নিজের লোক—এস, বুঝলে—তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—

কিন্তু—

কোন কিন্তু নয়—আসা চাই—ঠিকানাটা জান বোধহয়—বার্ষট্টির কে, চৌরঙ্গী টেরেস—। উনি লাইন কেটে দিলেন।

বিরক্তিতে সুব্রতর মন ভরে উঠল, এ কি জুলুম! আলাপ নেই, পরিচয় নেই, অথচ চা-এর নেমন্তন্ন করে বসলেন!

শশাঙ্কমোহন দাঁতে পাইপ চেপে ঘরে প্রবেশ করলেন। কোন ভূমিকা না করেই বললেন, নমিতা বোধ হয় তোমায় ফোন করেছিল। আই মিন বাসবীর মা—আজ বিকেলে ওখানে চলে যেও। ওরা অত্যন্ত সজ্জন প্রকৃতির লোক।

আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত নেই। ওখানে গিয়ে অনর্থক বিব্রত বোধ করব।

এইভাবেই আলাপ-পরিচয় হয়। সোসাইটির সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে বইকি। ওখানে না গেলে আমার সম্মানের ওপর ধাক্কা লাগবে মনে রেখো।

*　　　*　　　*

ছ'টার সময় সুব্রত বাষট্টির কে, চৌরঙ্গী টেরেসে পৌঁছল। আধুনিক ধাচের বাড়ি। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ একটা রেস্টুরেণ্ট। বাড়ির মালিক সপরিবারে থাকেন দোতলায়। সিঁড়ির মুখের কলিং পুস করতে মিসেস মুখার্জী নিজে এসে ওকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বসালেন সুসজ্জিত ড্রইংরুমে।

মিসেস মুখার্জীর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। কোনকালে যে তিনি সুন্দরী ছিলেন এখন দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। চলন-সই চেহারা। কাকিমার সঙ্গে তাঁর কোন মিল সুব্রত খুঁজে পেল না। সাজ-পোশাকে এত উগ্র আধুনিকতা, কোন বর্ষীয়সী মহিলার, সে আগে কখনো দেখেনি।

আমি জানতাম তুমি আসবে। সময় পেলেই চলে এস। আমি বড় একলা। উনি কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাসবী গান-বাজনা নিয়েই আছে। অফুরন্ত সময় কিভাবে যে কাটবে ভেবে পাই না।

সুব্রত থেমে বলল, সময় কাটানোটা আর এমন কি শক্ত! বই পড়ুন, সিনেমা দেখুন, ক্লাবে চলে যান—

তাও তো করি।

মিসেস মুখার্জী বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে আদেশ করলেন।

এই সময় বাসবী ঘরে এল। পরিপাটি করে সেজেছে। বাড়িতে কেউ এত সেজে থাকে না।

এতক্ষণ অনুপস্থিত থাকার কারণ, মেক্-আপের ফাইনাল টাচ দিচ্ছিল। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে হেসে বাসবী কোচে বসল। নানা ধরনের আলাপ চলতে লাগল তিনজনের মধ্যে।

সুব্রত অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু উপায় কি? বেয়ারা ট্রেতে করে চা ও খাবার নিয়ে এল। এলাহি আয়োজন। সুব্রতর কোন আপত্তি শুনলেন না মিসেস মুখার্জী। জোর করে তাকে সমস্ত খাওয়ালেন। আটটার সময় সে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

মিসেস মুখার্জী বললেন, আগামী সোমবার দিন নিশ্চয় এস।

ওঁর সঙ্গে আলাপ হল না। রবিবার উনি পুরুলিয়া থেকে কাজ সেরে ফিরছেন।

দেখি—

বাসবী বলল, দেখবেন আবার কি? আসা চাই!

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মিসেস মুখার্জী বললেন, যাও, সুব্রতকে পৌঁছে দিয়ে এস।

তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

এই সময় এধারে একেবারেই ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। গাড়ি নিচে পার্ক করা আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

সুব্রত আর প্রতিবাদ করল না।

গাড়ি স্টার্ট নেবার পর বাসবী বলল, আপনি ভীষণ লাজুক!

এ অপবাদ কিন্তু আগে কেউ আমায় দেয়নি।

তবে আমাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলছিলেন না কেন?

সুব্রত নির্বিকার গলায় বলল, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ বিশেষ আমি পাইনি। তাই আমি আন-ইজি ফিল করছিলাম। ধীরে ধীরে এই ভাবটা কেটে যাবে, কি বলেন?

বাসবী হাসল।—কাটবেই তো!

খাপছাড়াভাবে আরো দু'চার কথা হল দু'জনের মধ্যে।

*   *   *

সোমবার দিন মিসেস মুখার্জীর ওখানে সুব্রত গেল না।

মঙ্গলবার দিন বাসবী ফোন করল। গুরুতর কাজ থাকায় যেতে পারেনি জানাল তাকে। একথাও জানিয়ে দিল, দিন সাতেক তার আরো ব্যস্ততা থাকবে।

শশাঙ্কমোহন সমস্ত রিপোর্ট'ই পাচ্ছিলেন। শালীর মেয়ের সঙ্গে সুব্রতকে গেঁথে দিতে পারলে, নিজের আওতায় তাকে রাখতে পারবেন। বাসবীর সঙ্গে আলাপ হবার পর শ্রীমান যে ঘাড় মুচড়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্য দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। সুব্রতর

পিছলে পড়া ভাব ভাল লাগল না শশাঙ্কমোহনের। অগত্যা সমস্ত দিক সামলাবার জন্য তাঁকেই কাজে নামতে হল।

ফোনে বাসবীকে বিশেষ কাজের জন্য চাপ আছে বললেও, ব্যস্ততা বিশেষ ছিল না সুব্রতর। একটা ফাইল নিয়ে আনমনে নাড়াচড়া করছিল সে।

শশাঙ্কমোহন ঘরে প্রবেশ করলেন।—তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা ছিল সুব্রত!

বলুন?

গতকাল বৌদির চিঠি পেয়েছি।

ও! কি লিখেছেন তিনি?

তোমার বিয়ের জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আগেও কয়েকবার এ সম্পর্কে লিখেছেন। আমারও তাই ইচ্ছে। বিয়ে করে তোমার এবার সংসারীই হওয়া উচিত।

সুব্রত পরিষ্কার গলায় বলল, আমি এখন বিয়ে করতে চাই না।

এ কোন কাজের কথা নয়। তোমার মত বয়সে দাদা-আমি বিয়ে করে পুরোনো হয়ে গেছি। বৌদির দিকটাও তোমার দেখা দরকার। তাঁর একটি মাত্র ছেলে তুমি, বৌকে নিয়ে তিনিও তো ঘর করতে চান!

আমি সবই বুঝি কাকা। কিন্তু—

শোন সুব্রত, ছেলেমানুষী করো না। বাসবীকে তুমি দেখেছ। গান-বাজনায়, দেখতে-শুনতে—সব দিক দিয়েই চমৎকার মেয়ে। আমার ইচ্ছে ওকেই তুমি বিয়ে কর। আমি বলছি তুমি সুখী হবে।

ক্ষমা করবেন। আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

কেন? বাসবীকে কি তোমার পছন্দ নয়?

দেখুন, আমি আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

নিভন্ত পাইপ এতক্ষণ শশাঙ্কমোহনের হাতেই ছিল। এবার ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শ্লেষের সঙ্গে বললেন, বাসবীকে কেন তোমার পছন্দ নয় তা আমি জানি। তুমি নিজেকে অত্যন্ত

চালাক ভাবতে পার, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেওয়া এত সহজ নয়। রায়ের মুখ থেকে আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছেন আপনি ?

একটা বেজাত, হা-ঘরের মেয়ে সম্পর্কে তুমি ইণ্টারেস্টেড।

কাকা, কোন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করা বোধ হয় ঠিক নয়।

তাই নাকি! কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ঠিক নয়, এবার তোমার কাছে শিখতে হবে ? ছি ছি সুব্রত, এই টেস্ট তোমার ? বংশের মান-মর্যাদাকে এইভাবে নষ্ট করছ ? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণগলায় বলল, কেন বলুন তো ? আমি এমন কিছু করিনি যার জন্যে লজ্জা পেতে হবে। কথাটা যখন তুললেন তখন আপনাকে বলে রাখাই ভাল, মণিকাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

শশাঙ্কমোহন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, আমার মুখের ওপর এ কথা বলতে তোমার আটকালো না ? আজ দাদা বেঁচে থাকলে তুমি এতটা সাহস দেখাতে পারতে ?

বাবা বেঁচে থাকলে আমি কি করতাম সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমার জন্যে আপনি আর ব্যস্ত হবেন না। নিজের ভাল-মন্দ বিচার করবার বয়স আমার হয়েছে।

আর দাঁড়াল না সুব্রত। কথা ক'টা বলেই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অফিস বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীরা কেউ নেই। সৌভাগ্যক্রমে ফুটপাথে নেমেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। মণিকাদের বাড়ির নির্দেশ দিয়ে চিন্তায় সুব্রত গা ভাসিয়ে দিল। কাকার সঙ্গে পরিষ্কার কথাবার্তা হওয়ায় ভালই হল। তা ছাড়া এত খিচখিচের মধ্যে কাজকর্ম করাও চলতে পারে না। এর ব্যবস্থাও করে নেওয়া দরকার।

কিন্তু সে পরের কথা। এখন বিষয় হল মণিকা। ওর সম্পর্কে মাকে সমস্ত কথা জানানো দরকার। তিনি কি আপত্তি করবেন? সুব্রত বিলক্ষণ চেনে তার মাকে। ছেলের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়াই তাঁর অভ্যাস। তবে মাকে জানবার আগে মণিকাকে কথাটা বলে নেওয়া উচিত।

রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট জায়গায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রেবু বাইরেই ছিল। সুব্রতকে দেখেই ছুটল মেজদিকে খবর দিতে। সে জানে সুব্রতর প্রয়োজন কাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মণিকা তার পাশে এসে বসল। ট্যাক্সি আবার সচল হল।

মুখ এত অন্ধকার কেন?

সুব্রত ফিকে হেসে বলল, ব্যানার্জী অ্যাণ্ড রে'রে একজন ব্যানার্জী এবার খসল!

তার মানে?

ঝামেলা আর ভাল লাগছে না। তুমি তো জান, কাকার সঙ্গে আমার কেমন ব্যাড টার্মস্ যাচ্ছে। তাই ভাবছি আমার অংশটা কাউকে বিক্রী করে দেব।

মণিকা অবাক হয়ে বলে, বিক্রী করে দেবে?

হ্যাঁ, কোম্পানীতে আমার ফিফ্‌টি পারসেণ্ট শেয়ারে আছে। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

এটা কি ভাল হবে?

এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। তোমার নিরাপত্তার দিকটাও তো আমার দেখা দরকার!

আশ্চর্য হয়ে মণিকা বলল, আমার—?

সুব্রত ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, হুঁ! কাকা তাঁর শালীর কন্যাটিকে আমার স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টায় আছেন।

এ তো সুখবর! তাহলে আর কালমাত্র বিলম্ব না করে তাঁকে কাঁধে তুলে নাও।

মণিকাকে সে কাছে টেনে নেয়।—তা যে আর হবার উপায় নেই!

অবুঝের মত প্রশ্ন করে মণিকা, কেন নেই ?

বাড়িতে চিঠি দিতে পারছি না। বল, মাকে কি লিখব ? ঘরে বৌ আনতে যে তাঁর অনেক দিনের সাধ !

* * *

মিঃ ব্যানার্জী, আপনার ম্যাচ-বক্সটা দিন তো !

চমক ভাঙল সুব্রতর। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল সুব্রত। সামনেই সিগারেট হাতে অমিতাভ দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে সে দেশলাইটা এগিয়ে দিল।

ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে কম হয়ে আসছে। সামনেই বর্ধমান। জানালার সার্সিটা তুলে সুব্রত বাইরের দিকে তাকাল। আবছাভাবে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। এখানে নেমে গেলে কেমন হয় ?

রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে মণিকা লুচি বেলছে।

স্টোভের ওপর থেকে কড়া নামিয়ে মা বললেন, বিলেত থেকে সুব্রত কি রকম হয়ে ফিরছে কে জানে !

মণিকা উত্তর দিল না।

মা আবার বললেন, সত্যি আমরা অবিচার করেছি। তার মত যোগ্য ছেলে যেচে এগিয়ে এসেছিল। অথচ আমরা—তিনি আর কথাটা শেষ করলেন না।

মণিকার মন অভিমানে গুমরে উঠল। মনের মধ্যে ভীড় করে এল অসংখ্য কথা। মনের পর্দায় ভেসে উঠল অতীতের ছায়া ছায়া ছবি।

সেদিন অফিস থেকে এসে মণিকা কাপড় ছাড়ছে। যেন বেশ খুশি-খুশি ভাব। দুপুরে সুব্রত ফোন করেছিল। বেশ বিনয় করে বলেছিল, অফিসের পর মিস সাহেবা কি এই গোলামের ওপর কৃপাদৃষ্টি দেবেন—তাহলে তাঁর সেবায় সে কিছু সময় আত্মনিয়োগ করতে পারে। এত দুষ্টুমি করতে পারে ! কাপড় বদলাতে বদলাতে আপন মনে হেসে ফেলল মণিকা।

এই সময় বাবার অনুচ্চ গলার আওয়াজ ভেসে এল, আমি তোমার কথা অস্বীকার করছি না তো ! সুব্রত খুবই ভাল ছেলে, কিন্তু এদিকটাও তো ভেবে না দেখলে চলবে না !

সুব্রত ! মণিকা দেওয়ালের দিকে আরো একটু ঘেঁষে যায় ।

মা'র গলা পাওয়া গেল, তাই বলে মেয়েটাকে এইভাবে—

মণির বিয়ে হয়ে গেলে সংসার অচল হয়ে পড়বে । ওর আয়ের ওপরই আমাদের নির্ভর, আমি ক'টাকাই বা পেন্সন পাই ! তুমি ভেবে দেখ, আমি বাপ—তবু আমায় এই কথা বলতে হচ্ছে ।

মণিকা কাঠ হয়ে গেছে ।

ওঁরা ভেবেছেন, মণিকা এখনও বাথরুমে রয়েছে ।

সুব্রত যদি বিয়ের প্রস্তাব করে ?

বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সরাসরি না বলতে হবে ।

মণিকা আর ওখানে দাঁড়াল না । পা টিপে টিপে ঘরের অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল । চিন্তার কালো ছায়া সারা মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল । এত বড় প্রাচীর যে তার ও সুব্রতর মধ্যে গড়ে উঠেছে বুঝতেই পারেনি । অবশ্য এই প্রাচীরকে ইচ্ছে করলেই ভেঙে ফেলা যায় । কিন্তু—

সুব্রতর সঙ্গে দেখা হলেই মনের মধ্যে ভয় জাঁকিয়ে আসে । এই বুঝি সে সেই বিশেষ কথাটা বলে ফেলে ! একদিন সত্যিই সেই চরম পরীক্ষার দিন এসে গেল ।

ধাবমান ট্যাক্সির মধ্যে ওকে কাছে টেনে নিয়ে সুব্রত বলল, বাড়িতে চিঠি দিতে পারছি না । বল, মাকে কি লিখব ? ঘরে বৌ আনতে যে তার অনেক দিনের সাধ ! এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে মণিকা ? মন যা চায় মুখে প্রকাশ করা তা ধৃষ্টতা । নিজের সুখের জন্য ও পৃথিবীতে আসেনি । কর্তব্য—সামনে রয়েছে বিরাট কর্তব্য ।

চুপ করে রইলে যে ?

একটু ইতস্ততঃ করে মণিকা বলল, এত তাড়াতাড়ি করবার কি

আছে ? আর কিছুদিন গেলে হত না ?

কেন বল তো ? আমাকে কি এখনও নির্ভর করতে পারছো না ?

না, না, তা নয়।

তবে ?

মানে…একটা বাধা আছে।

বাধা ! বাড়িতে আপত্তি উঠবে ?

মণিকা সুব্রতর আরো কাছ ঘেঁষে বসল। আদুরে গলা বলল, আজকের বিকেলটা বেশ। ড্রাইভারকে বল না গঙ্গার দিকে যেতে !

সুব্রত অবাক হয়ে ওর দিকে একবার তাকাল। তারপর গঙ্গা দিকে যেতে নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

অনেক ভেবেছে মণিকা। কিন্তু নিজের অনুকূলে কোন সমাধা খুঁজে পায়নি। সুব্রতকে ও আন্তরিকভাবে ভালবাসে। তাকে ছেড়ে থাকাটা যে কত কষ্টকর তাও ওর অজানা নয়। তবুও নিজে সুখকে আজ বড় করে দেখলে চলবে না। বাবা মা ভাইদের প্রতি ওর একটা কর্তব্য রয়েছে বইকি !

কয়েকদিন হল সুব্রত বাড়ি গিয়েছে। সেদিনের সেই কথাবার্তা পর সে যেন কেমন একটু মনমরা। গঙ্গার ঘাটে গিয়েও কথাটা তুলেছিল। মণিকা ভেঙে বলতে পারেনি বাধাটা কোথায়। তখন কার মত নিজেকে বাঁচিয়ে ছিল তাকে আদরে সোহাগে বিপর্যস্ত করে দিয়ে।

আর আধঘণ্টা পরেই অফিস শেষ হবে। কাগজ-পত্রগুলে গুছিয়ে রাখছে মণিকা। কাজে আজ একেবারে মন বসেনি। মন পড়ে আছে সুব্রতর কাছে। তার গতকাল ফিরবার কথা ছিল ফিরে এসে থাকলে নিশ্চয় দেখা করতো। কেন ফেরেনি কে জানে !

অভাবনীয়ভাবে সুব্রত এই সময় অফিসে এল। উসকো খুসকো মলিনা চেহারা। সোজা স্টেশন থেকেই আসছে বো

হয়। আনন্দ এবং আশঙ্কা দু-ই মণিকাকে উদ্বেল করে তুলল। মুখে কিন্তু নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল।

সুব্রত বলল, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা আছে। বাইরে এস।

মণিকা নিজের মনকে দৃঢ় করল।

এখন আমার একেবারেই সময় নেই। একটা বিশেষ কাজ সেরে রাখতে হবে। তাছাড়া সাড়ে চারটের আগে অফিস বন্ধ হয় না।

সুব্রত বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। তারপর দৃঢ় গলায় বলল, বাজে অজুহাত দেখিয়ে কোন লাভ নেই। তোমাকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মণিকা আর কথা না বাড়িয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাতে গিয়ে বসল দু'জনে।

দু'জনেই চুপচাপ।

মণিকাই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করল, এইভাবে অফিস থেকে টেনে আনলে, সকলে কি ভাবল বল তো?

ভাবলে কিছু আসবে যাবে না। ওখানে আর কোনদিন তুমি ফিরে যাচ্ছ না।

তার মানে?

মানে, ইংল্যাণ্ড রওয়ানা হবার আগে—

মণিকা বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে, তুমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছ?

হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম, কাকার সঙ্গে ঝগড়া বাড়িয়ে লাভ নেই। অফিস উনিই দেখাশোনা করুন। আমি বরং ইংল্যাণ্ড থেকে এগ্রিকালচার সম্বন্ধে কিছু শিখে আসি। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। তাই যাবার আগে বিয়েটা সেরে যেতে চাই। মাও তাই চান।

বিয়ে···কিন্তু···

তোমার আপত্তি আছে নাকি? আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি আজকাল এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছ আমাকে। এর কারণ কি?

তুমি ভুল ধারণা নিয়ে আছো। আমি একটুও বদলাইনি।

তবে—

কি যে বলবো তোমায়—! তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

কি বললে !!!

এমন কতগুলো পারিবারিক কারণ আছে যার জন্যে…। কেন, আমরা কি পারি না বন্ধু হিসেবে থাকতে?

প্রায় দু'মিনিট মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুব্রত।

তারপর বলল, ড্রাইভার, গাড়ি রোকো।

ট্যাক্সি ফুটপাথের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

একটা দশটাকার নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে সুব্রত বলল, মেমসাহাব কো ঘরে পৌঁহচায় দেনা!—চললাম মণিকা। রবারের মত টেনে আন্তরিকতার সম্পর্ককে বাড়ান যায় না তা আমি জানি। তোমার আপত্তির ওপর জোর খাটাতে চাই না। তুমি তোমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়েই সুখে থাক।

এই—কি হচ্ছে? মণিকা ওর হাত চেপে ধরল।

আমার অবস্থা একটু বোঝবার চেষ্টা করবে কি? সুব্রত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে গেল ট্যাক্সি থেকে।

কত দ্রুত ঘটে গেল সমস্ত কিছু মণিকার চোখের পাতা ভিজে উঠল। ও বাধা দিতে পারল না সুব্রতকে। ওর এই আত্মত্যাগের মূল্য তো অন্যের কাছে কানাকড়িও নয়। কত অসহায়—কত নিরুপায় মণিকা!

তারপর মাস দিন মিলিয়ে কেটে গেছে বছরখানেক। সুব্রত ইংল্যাণ্ড চলে গেছে কবে। যে দুঃসহ বেদনা বুকে চেপে মণিকা একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—আজ কিন্তু আর কোন বাধা নেই। সুসময় যখন আসে, তখন হঠাৎই এসে পড়ে। দেবুর চাকরি হয়েছে। ভাল মাইনে, ওভার টাইম আছে। বাবাও তাঁর এক বন্ধুর সহযোগিতায় একটা তেলের কলে চাকরি পেয়ে গেছেন।

কাজেই সংসারে মণিকার প্রয়োজন গৌণ।

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মণিকা মিঃ রায়ের কাছে গিয়ে সুব্রতর ফিরে আসার তারিখটা জেনে এসেছে। এবার তাকে ও নিজের করে নেবে। কোন বাধা, কারো আপত্তি, কোন দায়িত্বকেই আর প্রশ্রয় দেবে না।

সমস্ত আন্দাজ করে মা একদিন বলেছেন, সুব্রত ফিরে এলে ওঁকে বলব বিয়ের কথা পাড়তে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে মণিকা, আজ তোমাদের প্রয়োজন মিটে গেছে তাই এ কথা বলছো। সেদিন তো একটা সান্ত্বনার বুলিও তোমাদের মুখ থেকে বেরোয়নি ?

মা চুপ করে গেছেন। কি আর বলবেন! নির্জলা বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে টুঁ শব্দ করার মুখ কি তাঁদের আছে!

স্টোভের ওপর আবার কড়া চাপিয়ে মা বললেন, ও কি, চুপ করে বসে আছিস যে ? ও ক'টা বেলে দে!

মণিকার চমক ভাঙল। আজ ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। হাত আবার সচল হল, লুচি বেলায় মন দিল মণিকা।

সুব্রত রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকাল, এগারটা বাজতে পনেরো। বর্ধমান কখন পার হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও ওখানে নেমে যায়নি।

লিলুয়া অতিক্রম করল। ডাউন বম্বে মেলের গতি মন্থর হয়ে আসছে। হাওড়া ব্রীজ দেখা যাচ্ছে দূরে। সেদিকে তাকিয়ে সুব্রত একটা সিগারেট ধরাল। অন্য দু'জন যাত্রী ও অমিতাভ নিজেদের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। এদের কত আনন্দ, কত আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘদিন পরে আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার কত অধীরতা। সুব্রত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, ওদের সঙ্গে তার কত পার্থক্য!

মিঃ ব্যানার্জী, আপনি মালপত্র ঠিক করে নিচ্ছেন না ?

তেমন ব্যস্ততা নেই। ধীরে-সুস্থে গোছালেই হবে।

বিসর্পিল গতিতে বম্বে মেল ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনের আ
নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের আর কুলীদে
চেঁচামেচি—চারিধারে বিশৃঙ্খলার ঝড় বইতে লাগল।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, এই যে
এধারে! হ্যালো মিকি—স্বপন, তুমিও এসেছ? বৌদির খবর কি

ওদিক থেকেও প্রশ্নের বিরাম নেই।—জাহাজে কোন কষ্ট হয়নি
তো?

ওয়েল অমিতাভ, রংটা তো একেবারে ও-দেশী করে এনে
দেখছি!—নেমে এস নেমে এস—

কুলীরা মাল নামিয়ে নিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অমিতাভ বলল, তাহলে চলি মিঃ ব্যানার্জী
কোনদিন যদি আইন-ঘটিত কোন সমস্যায় পড়েন তবে অমিতাভ
চৌধুরী বার-এট-ল'কে স্মরণ করবেন।

সুব্রত করমর্দন করে বলল, ও সিওর! সো লঙ মিঃ চৌধুরী—

অমিতাভ নেমে গেল।

প্ল্যাটফর্মে ভিড় কমে এসেছে। এবার নামা চলতে পারে
বেডিংটা বেঁধে ফেলে বার্থের তলা থেকে সুটকেশ টেনে বার কর
সুব্রত। বাকি মাল ব্রেকে আছে। ছাড়িয়ে নিতে হবে। দরজা
গোড়ায় কে এসে দাঁড়িয়েছে! কার একটা ছায়া! সুব্রত ঘু
দাঁড়াল—একি! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে ন
সুব্রত।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। ওর মুখে অজ
আবিরের রক্তিমাভা।

একি, তুমি?

আমিই তো!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।

মণিকা কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, কেন, আমার আসাটা বি

অন্যায় হয়েছে ?

তোমাকে যে দু'বছর আগেই আশা করেছিলাম ! কই, সেদিন আমার ডাকে তো সাড়া দাওনি ?

সেদিন কি তুমি আমাকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলে ? আমার কুণ্ঠা কোথায় তা জানবার আগ্রহ দেখিয়েছিলে ? তোমার অপেক্ষায় কিভাবে দিন গুনেছি তা কি তুমি জান ?

মণিকার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। সুব্রত ওর কাঁধে হাত রেখে নম্র গলায় বলল, আজ বলার দিন। বলে যাও—

আমি আর কিছু বলব না।

মণিকা—

এতদিনের সব অভিমানের যেন অবসান হল। সবলে ওকে কাছে টেনে আনল সুব্রত। মণিকার দু'চোখ আবেশে নুয়ে পড়ল। কথা বলার শক্তিটুকুও যেন আর নেই। সুব্রতর উষ্ণ স্পর্শ ওকে ক্রমেই নিয়ে চলেছে এই পৃথিবী থেকে দূরে—অনেক দূরে।

চার

শীতের সকাল।

লনে বেতের চেয়ারে বসে নাতি-নাতনীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন অনাদিনাথ। সকালের এই মিষ্টি রোদে বসে চা-পর্ব শেষ করতে ভালই লাগে তাঁর। বিশেষ নাতি-নাতনীর সঙ্গটাও কিছু কম লোভনীয় নয়। পরিচিত মহলে রাশভারী ও গম্ভীর হিসেবে অনাদিনাথের একটা সুনাম আছে। অবশ্য স্বপ্না ও আনন্দ সে আওতায় পড়ে না। এদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশেন তিনি।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে স্বপ্না বলল, এবার কিন্তু সিজিন ফ্লাওয়ার একেবারেই ফুটল না দাদু।

বাগানের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অনাদিনাথ বললেন, হুঁ, তাই দেখছি! তাছাড়া বাগানের অবস্থাও দিন দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে।

কেন হবে না? মালিগুলো শুধু মাইনে নিতেই আছে। কাজের মধ্যে খালি পড়ে পড়ে ঘুম মারা।

আনন্দ একটা কেক তুলে নিয়ে কামড় দিতে দিতে বলল, চোখের ওপর বাগানটা, তারই এই অবস্থা; তাহলে আলীপুরের বাগানের অবস্থা কত শোচনীয় ভেবে দেখ!

বাগানের সখ অনাদিনাথের আবহমানের। ঐশ্বর্য আর বৈভবের প্রথম ধাপে পা দেওয়া থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করে এসেছেন এর জন্যে। বাড়ির চারপাশ ছাড়াও আলীপুরে একটা বিরাট বাগান আছে তাঁর।

এধারে কিছুদিন থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন বাগানের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এবছর একটিও ডালিয়ার মুখ

দেখতে পেলেন না এখনও অবধি। তাই কয়েকদিন ধরেই মালিদের কাজের এই গাফিলতি তাঁকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে।

চিন্তিত কণ্ঠে অনাদিনাথ বললেন, ভাবছি একজন গার্ডেন কেয়ারটেকার রাখব কি না!

স্বপ্নার ভ্রূ নেচে উঠলো।—সে রকম লোক পাচ্ছ কোথায়?

পেপারে বিজ্ঞাপন দিলে এখুনি ঝুড়িখানেক আবেদন এসে পড়বে।

বয় এসে দাঁড়াল—সাহাব, টেলিফোন!

অনাদিনাথ ড্রেসিং-গাউনটা ঠিক করে নিয়ে উঠে গেলেন।

স্বপ্না চা শেষ করে আজকের দৈনিকপত্রখানা টেনে নিল।

দিদি, ডাঃ চৌধুরী আসছেন।

খবরের কাগজ সরিয়ে রাখল স্বপ্না। নিভাঁজ পানামা সুটে নিজেকে আচ্ছাদিত করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছেন ডাঃ চৌধুরী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ দেহটা তাঁর তেমন সবল নয়। মুখের মধ্যে নাকটা চাপা হলেও ভাসা-ভাসা চোখ দুটো সব সময়েই স্বপ্নালু। স্মার্ট নন, কিন্তু নিজের স্মার্টনেস দেখাবার জন্যে সর্বদাই ব্যস্ত তিনি।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল স্বপ্না।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে ডাঃ চৌধুরী বললেন, না এসে উপায় কি! যা বিরাট দায়িত্ব আপনারা চাপিয়েছেন আমার ওপর! এত বড় ক্লাবটাকে ম্যানেজ করা কি সোজা কথা!

আপনি ছাড়া এই দায়িত্ব আর কে নিতে পারে বলুন না?

হাসলেন ডাঃ চৌধুরী।—সত্যি কথা বলতে কি মিস চ্যাটার্জী,

আমি আপনার কথাতেই এ দায়িত্ব নিয়েছি। আপনার রিকোয়েস্ট ইগনোর করা যে কত কষ্টকর আমার পক্ষে, আমি তা ঠিক—

ডাঃ চৌধুরীর হাতে খবরের কাগজটা দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলল স্বপ্না, কি যে বলেন আপনি? সব সময় আমার ভীষণ

লজ্জা করে ! কিন্তু কি বলতে এসেছিলেন তা তো···

আমাদের প্রশান্ত মজুমদার এখান থেকে চলে যাচ্ছে। ওকে ফেয়ার-ওয়েল দেওয়ার কথা হচ্ছে। আপনাদের আলীপুরের বাগানে সেরিমনিটা হলে কেমন হয় ?

কোন্ প্রশান্ত ?—ও, দ্যাট ইয়ং ব্যারিস্টার ? এখান থেকে চলে যাচ্ছে নাকি ?

হ্যাঁ। পাটনা বারে জয়েন করবে।

বেশ ! যেদিন ইচ্ছে আমাদের বাগানে স্বচ্ছন্দে সেরিমনিটা করতে পাবেন।

যাক ! একটা দুর্ভাবনা গেল। বাই দি বাই—সেদিন কিন্তু আপনার ড্যান্স প্রোগ্রামের একটা অন্যতম আইটেম !

এককাপ চা ডাঃ চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বপ্না বলল, সে দেখা যাবে সেদিন। আপনি এখন চা খান।

বিরাট সেক্রেটেরিয়ট টেবিলের সামনে বসে কতকগুলো কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন অনাদিনাথ। স্বপ্না ঘরে এল।

কাউকে পছন্দ হল দাদু ?

এখনও অবধি দু'জনকে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। বাগান সম্বন্ধে তাদের বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

ঠোঁট উল্‌টে স্বপ্না বলল, আমার কিন্তু ওদের মধ্যে কাউকে পছন্দ নয়। ঐ রকম গেঁয়ো লোকদের আমার মোটেই ভাল লাগে না।

মৃদু হেসে অনাদিনাথ বললেন, এখনও বাইরে কয়েকজন অপেক্ষা করছে। দেখ, তাবের মধ্যে যদি কাউকে তুমি এবেল্ মনে কর !

বেল টিপলেন তিনি। বয় এসে দাঁড়াল।

আর ক'জন আছে বাইরে ?

আজ্ঞে চারজন।

পাঠিয়ে দাও একজনকে।

মিনিট কয়েক পরেই দরজা ঠেলে একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করল।

যুবকটি প্রিয়দর্শন ও গৌরবর্ণ। দেহের পোশাক-পরিচ্ছদও শালীনতার পরিচায়ক।

অনাদিনাথ গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম ?

আভিজাত্য ও অর্থের গৌরবে গরীয়ান তিনি, কাউকে বড় একটা সম্মান দিয়ে কথা বলেন না। এ ক্ষেত্রে চাকরির উমেদার এই যুবকটিকে সম্মানসূচক সম্ভাষণের উল্লেখের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনাদিনাথ নিজের সম্মুখস্থ কাগজপত্রগুলো নেড়ে-চেড়ে বললেন, শেখর—কই, এ নামে কোন অ্যাপ্লিকেশান তো দেখছি না ?

আমি আবেদন করিনি ! সরাসরি দেখা করতে এসেছি।

স্বপ্না ও অনাদিনাথের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল।

হুঁ ! কতদূর পড়াশুনা করেছ ?

আই এ. পাশ করেছি।

স্বপ্না প্রশ্ন করল, বাগানের কাজ-কর্মের বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা আছে ?

আছে কিছু। বিহারের রাজ-বানেলি এস্টেটের বাগানে কিছু-দিন কাজ করেছিলাম।

অনাদিনাথ আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। শেখরের প্রত্যেকটি উত্তরই তাঁর মনোমত হল। শেষে তিনি বললেন, যদিও তুমি অ্যাপ্লিকেশান করনি, তবে তোমাকেই আমি মনোনীত করলাম। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তুমি পারবে।

আপনার অনুগ্রহ !

যে রকম বেকার-সমস্যা চলেছে তাতে এই কাজের জন্যে বি. এ. বা এম. এ. পাশ ছেলে সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হত না। তবু আমি তোমাকে মনোনীত করছি, তোমার স্মার্টনেস দেখেই।

কথাটা শেষ করেই তিনি স্বপ্নার দিকে তাকালেন।

শেখর দৃষ্টি নত করে বললে, আমি কি তাহলে…

হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পার। কাল সকালে তোমার বিছানাপত্র নিয়ে চলে আসবে। আমি লোক দিয়ে তোমায় আলীপুরের বাগানে পাঠিয়ে দেব। ওখানে যে রেস্ট হাউস আছে তাতেই তোমায় থাকতে হবে।

শেখর আর কিছু না বলে হাত তুলে দু'জনকে নমস্কার করল। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন থেকেই শেখর কাজে লেগে গেল। কাজ তেমন শক্ত কিছু নয়। বাগানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা ও মালিদের দিয়ে ঠিকমত কাজ আদায় করে নেওয়া। বিরাট আয়তনের এই বাগানটি। বাস করার পক্ষে রেস্ট হাউসটিও চমৎকার। ভালই লাগছে শেখরের। সে এই রকম নির্জন পরিবেশই ভালবাসে। মাঝের পাঁচটা বছর গোলমালের মধ্যে কাটার পর, এই নির্জনতা আবার তাকে উচ্ছ্বসিত করে তুলছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে শেখর লতানে গোলাপ গাছটা খুঁটিয়ে দেখছিল। গাছের গোড়াটা আর একবার খুঁড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে কিনা ভাবছিল।

কি দেখছেন ওখানে ?

শেখর মুখ ফেরাল। সপ্রতিভ মুখে বছর পনরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে।

আমায় চিনতে পারছেন না বোধ হয় ? আমি আনন্দ—মানে অনাদিবাবু আমার দাদু হন।

ও ! কিছু বলবেন কি ?

আনন্দ হাল্‌কাভাবে বলল, ঐ আজ্ঞে-আপনিগুলো আমি একেবারে পছন্দ করি না। দেখছেন, আমি কত ছোট আপনার চেয়ে—আমায় তুমি বলবেন। আচ্ছা, আমি আপনাকে কি বলে ডাকব ?

আমায়···আমায়—

শেখরদা বললে কেমন হয়? আপনার আপত্তি আছে কি?

কিছুমাত্র না। তারপর, বাগান দেখতে এলে?

আজ স্কুল ছুটি—চলে এলাম। আমিও মাঝে মাঝে বাগানে কাজ করতে আসব। আমার ভাল, লাগে গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটতে, বেড়্যার ওপর লতাগুলো তুলে দিতে।

এ সমস্ত করলে তোমার দাদু রাগ করবেন।

রাগ করবেন কেন? আমার দাদু সেরকম নন।—তাহলে, আমি প্রত্যেক ছুটিতে এখানে চলে আসব কিন্তু!

সকাল থেকেই আকাশ আজ মেঘলা। শেখর ও আনন্দ একটা ক্রীমশন রোজের পরিচর্যায় ব্যস্ত রয়েছে। আজ রবিবার। তাই আনন্দ এসেছে। দু'জনেই কাজের মধ্যে রয়েছে। হঠাৎ ওদের চমক ভাঙল একটা মোটরের শব্দে। শেখর গেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, খানতিনেক মোটর এসে দাঁড়িয়েছে পর পর। স্বপ্না গাড়ি থেকে নামছে। সঙ্গে আরো কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা।

শেখর আবার নিজের কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগানের চারিদিক হাসি-উচ্ছ্বাসে ভরে গেল। বাগানের চারিধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

স্বপ্না এসে দাঁড়াল ওদের কাছে, সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে।

আনন্দ, এসব কি হচ্ছে?

বাগানের কাজ করছি দিদি!

ছোটলোকদের মত মাটি ঘাঁটতে তোর লজ্জা করছে না?

কেন, লজ্জা করবে কেন?

বেশি তর্ক করতে হবে না। হাত ধুয়ে গাড়িতে বোসগে যা।

শেখরের ঠোঁটের আগায় অনেকগুলো কথা এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সে কিছুই বলল না। আনন্দ হাত ধুতে গেল।

শেখরবাবু—

বলুন?

ভবিষ্যতে আপনি আনন্দকে আর বাগানের কাজে টানবেন না। আমরা এসব পছন্দ করি না।

শান্তকণ্ঠে শেখর বলল, আমি তো টানিনি?

এই যে মিস চ্যাটার্জী, আপনি এখানে?

কথাগুলি বলতে বলতে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ চৌধুরী এলেন।

স্বপ্না সহাস্যে বলল, বাগান ঘুরে এলেন? কেমন লাগল?

মার্ভেলাস! এত ভাল গার্ডেন এর আগে আমি দেখিনি মিস চ্যাটার্জী। কণ্টিনেণ্টেও না—

ভীষণ বাড়িয়ে বলছেন!

অফকোর্স নট। বাঃ, চমৎকার ফুলটা তো—

ডাঃ চৌধুরী একটা বড় ধরনের গোলাপের দিকে হাত বাড়ালেন। শেখর বাধা দিল।

ফুলটা তুলবেন না। বিশেষ নমুনা হিসেবে রাখা হয়েছে ওটা।

হাত সরিয়ে নিয়ে ডাঃ চৌধুরী ভ্রূ কোঁচকালেন, এটি কে?

তীব্র চোখে শেখরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্না বলল, বাগানের কেয়ারটেকার।—ফুলটা আপনার পছন্দ ডাঃ চৌধুরী? নিন না!

স্বপ্না নিজের হাতে গোলাপটা তুলে ডাঃ চৌধুরীর বটন হোলে লাগিয়ে দিল। তার দিকে বিগলিত চোখে তাকিয়ে ডাঃ চৌধুরী বললেন, তাহলে কামিং থার্ড আমাদের পার্টি ফিক্সড হল! আপনারা কি বলেন?

সকলেই একবাক্যে সমর্থন জানাল।

ফেরার পথে ইলা বললে, তোদের কেয়ার-টেকারকে কিন্তু বেশ দেখতে!

ছোট মরিস মাইনর। গাড়িতে স্বপ্না ও ইলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। শক্তহাতে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে স্বপ্না বললে, হুঁ!

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে এরকম চেহারা কারুর নেই। ঠিক যেন অ্যাপোলো—

ভীষণ মনে ধরেছে দেখছি ! কিন্তু তোর রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না।

মৃদু হেসে ইলা বলল, কেন ? তোর মতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার এরাই শুধু রুচিকর—যারা সাধারণ কাজ করে তারা মানুষ নয় ?

তুই কি বলতে চাইছিস ?

পদমর্যাদা না থাকলেই যে মানুষ অমানুষ হবে, তার কোন মানে নেই। আবার পদমর্যাদা আছে, কিন্তু মনুষত্বের অভাব এরকম লোক পৃথিবীতে প্রচুর আছে। এই যে ডাঃ চৌধুরী 'মিস চ্যাটার্জী' আর মিস চ্যাটার্জী" করে গলে পড়ছেন, তোর মতে তিনি বোধ হয় খুব আদর্শ পুরুষ। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখিস তাঁর পেছনেও কত গলদ—

বাব্বা, তর্ক পেলে তুই আর কিছু চাস না। তোর লজিক নেওয়া যে সার্থক হয়েছে তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য।

ইলা আর কিছু না বলে মুখ টিপে হাসল একটু।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

ডাইনিংহলের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন অনাদিনাথ। ডিনারের সময় পার হয়ে গেছে, স্বপ্না এখনও বাড়ি ফেরেনি। এরকম ব্যতিক্রম আজকাল প্রায়ই ঘটছে। অনাদিনাথ যত আধুনিকই হোন না কেন, তবু অত্যধিক স্ত্রী-স্বাধীততায় তাঁর কোন সমর্থন নেই। তাই।

দরজার গোড়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্নেহপ্রভা। অনাদিনাথ বিপত্নীক হয়েছেন আজ বার বছর। পুত্রবধূ স্নেহপ্রভাই এরপর থেকে সংসার ও শ্বশুর, দু-ই পরিচালনা করে আসছেন।

অনাদিনাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, না না, এ ভাল কথা নয় বৌমা। এত রাত হল, এখনও বাড়ি ফেরার সময় হয়নি তার!

এরকম প্রায়ই হচ্ছে বাবা।

হুঁ, তাই দেখছি !—ঐ গাড়ির শব্দ হল, এল বোধ হয় ! আমি আজ আর তাকে কিছু বলতে চাই না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।

স্নেহপ্রভা ঘাড় নাড়লেন। তিনি এগিয়ে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। মিনিট কয়েকের মধ্যে স্বপ্না এল।

বড্ড খিদে পেয়েছে। খাবার দিতে বল।

টেবিলের ওপর প্লেটে আহার্য সাজান ছিল। স্বপ্না সেদিকে তাকিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

স্নেহপ্রভা বললেন, ক'টা বেজেছে ?

স্বপ্না রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, দশটা সাত।

এত রাত অবধি তুমি বাইরে থাক, তা আমি পছন্দ করি না।

কি বলছ যা-তা ? সামনে আমাদের ফাংশান, সেজন্যেই···

হোক ফাংশন, তবুও না। আইবুড়ো মেয়ে রাত দশটা অবধি বাইরে ধিঙ্গিপনা করে বেড়াবে, তা আমি বেঁচে থাকতে হবে না।

দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁটটা চেপে ধরে স্বপ্না। তারপর বলল, ও ! কিন্তু আমি বড় হয়েছি ! আমার একটা স্বাধীন মত আছে !

তোমার স্বাধীন মত তুমি চালিও বিয়ের পর এখন নয়। এখন দয়া করে খেয়ে শোওগে যাও। কাল থেকে ফিরতে যেন এত রাত না হয় !

কথাটা শেষ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন স্নেহপ্রভা। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল স্বপ্না। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দেখতে দেখতে ফেয়ার-ওয়েল সেরিমনির দিকটা এসে গেল। ফেয়ার ওয়েলের আড়ালে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা করাই উদ্দেশ্য হল এই সেরিমনির। স্বপ্নার ব্যস্ততার সীমা নেই ; যে ক্ষেত্রে তাদেরই বাগানে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে। এখন আটটা।

স্বপ্না বাইরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে শেষবারের মত আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাজ পোশাকটা দেখে নিচ্ছিল। স্নেহপ্রভা ঘরে এলেন।

এত সকাল কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

আজ আমাদের ফাংশান। তারই ম্যানেজমেণ্টে আলীপুরের বাগানে যাচ্ছি।

আর দাঁড়াল না স্বপ্না, ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্নেহপ্রভা তাকিয়ে রইলেন মেয়ের গতিপথের দিকে, তারপর দক্ষিণের টানা-বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে বেতের চেয়ারে বসে একটা ওয়েস্টার্ণ নভেলে গভীরভাবে একাগ্র ছিলেন অনাদিনাথ। স্নেহপ্রভা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মুখ তুলে অনাদিনাথ বললেন, কিছু বলবে, বৌমা ?

বলছিলাম···এবার স্বপ্নার আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, হুঁ ! বেশ— ! আচ্ছা, পাত্র হিসেবে ডাঃ চৌধুরীকে তোমার কেমন লাগে ?

আপনি প্রবীরের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ। প্রবীর ছেলেটি বেশ। বিলেত থেকে এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। আমার যতদূর ধারণা স্বপ্নারও অপছন্দ হবে না তাকে।

কিন্তু বাবা—অপনার ছেলে মারা যাওয়ার আগে শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে—

সেকথা আমার মনে আছে বৌমা। কিন্তু এই পনের বছরের মধ্যে কোন যোগাযোগই তো তারা আমাদের সঙ্গে রাখেনি। শুনেছি বটে শশাঙ্ক ছেলেটি ইংল্যান্ড গেছে।

আমরাও তো তাঁদের কোন খোঁজ-খবর নিইনি! আপনি একটা চিঠি দিয়ে দেখুন না !

বেশ! আজই মুঙ্গেরে চিঠি দিচ্ছি। তুমি বরং কলম আর প্যাডখানা দিয়ে যাও।

রেস্ট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বপ্না একটা লিস্ট দেখছিল। শেখর কি একটা কাজে বারান্দার দিকে এগিয়ে এল। স্বপ্না লিস্ট থেকে চোখ তুলে বলল, দেখুন, আপনার জিনিস-পত্রগুলো এখান থেকে আজকের মত সরাতে হবে।

বেশ, সরিয়ে নিচ্ছি!

তিনটের পরই চেয়ার-টেবিলগুলো এসে পড়বে, তার আগেই সমস্ত পরিষ্কার করে রাখবেন।

শেখর মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে কর্তব্যের খাতিরে একটা কথা বলতে হচ্ছে!

কি কথা?

আপনাদের আনন্দ-উৎসবের হাঙ্গামায় বাগানের যাতে কিছু নষ্ট না হয়, দয়া করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল স্বপ্নার।—কি বলতে চাইছেন আপনি?

যতদূর আন্দাজ করছি এটা একটা কক্‌টেল্‌ পার্টি। মাত্রাধিক্য হয়ে গেলে মানুষের জ্ঞান থাকে না, তাই—

কিন্তু সেজন্যে আপনায় দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

শান্তকণ্ঠে শেখর বলল, আমি এখানকার কেয়ার-টেকার বলেই এ কথা বলছি।

স্বপ্নার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।—জানেন আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন—জানেন আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে বরখাস্ত করতে পারি।

জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি কাজ করছি, আমাকে এই বাগানের ভাল-মন্দ দেখতেই হবে।

ভালমন্দ! আমাদের চেয়ে বাগানের প্রতি আপনার দরদই যে বেশি দেখছি! কিন্তু কোন মাইনে-করা লোক আমার মুখের ওপর এধরনের কথা বলে, এ আমি পছন্দ করি না। কাল থেকে আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন হবে না।

স্বপ্না আর দাঁড়াল না সেখানে।

সন্ধ্যা হয়েছে।

আলোয় আলোয় ঝলমল করছে বাগানের চারিধার। রুচিশীল বেশ-ভূষায় সজ্জিত অতিথিরা নির্দিষ্ট মণ্ডপে গিয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণ আগে হীরের আংটি দিয়ে প্রশান্ত মজুমদারকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এখন আরম্ভ হয়েছে বিচিত্রানুষ্ঠান। সকলের অনুরোধে স্বপ্নাই প্রথমে ডায়াসে এসে দাঁড়াল। নাচের পোশাকে তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

তাপস গুপ্ত ডাঃ চৌধুরীকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, কি রকম দেখছেন ?

চমৎকার ! আমার চয়েসকে নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা করবে গুপ্ত !

নিশ্চয়ই ! তবে একে সহজে কায়দা করতে পারবেন বলে।

হাসলেন ডাঃ চৌধুরী।—অনেক শক্ত মাটিতে খুঁটি পুঁতেছি গুপ্ত, সে তুলনায় এ তো অনেক নরম—অনেক তুলতুলে—

তারপর ডিনার শেষ হল। আবার সকলে জড় হলেন বাগানে। গল্প কিন্তু তেমন জমেও জমছে না। রঙীন মত্ততা অনেকের কণ্ঠে জড়তা এনে দিয়েছে।

অনেকে হাই তুলছেন। অনেকে বিদায় নেবার জন্যে উঠি-উঠি করছেন।

আইভি লতার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ চৌধুরী স্বপ্নাকে বললেন, আজ কিন্তু তোমার নাচ চমৎকার হয়েছে !

না, না। এমন আর কি ! অনেক রাত্রি হল। এবার আমাকে—

আজ না হয় একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরলে ! এরকম নাইটে তোমাকে পাশে নিয়ে রাত-ভোর কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

শুধু 'তুমি' সম্বোধনই নয়, ডাঃ চৌধুরী কথাবার্তাও তেমন ভাল বলে মনে হচ্ছে না স্বপ্নার। ও অসংলগ্ন কণ্ঠে বলল, এসব আপনি কি বলছেন ?

ডাঃ চৌধুরী ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি অনেকদিন

অনেক কিছু বলতে চাইছি। আমি তোমাকে চাই স্বপ্না—আট এনি কস্ট—

দু'পা পিছিয়ে এল স্বপ্না। আপনি একটু বেশি ড্রিংক করে ফেলেছেন ডাঃ চৌধুরী!

ড্রিংক! ওরকম দু'দশ পেগ বিয়ারে প্রবীর চৌধুরীর নেশা হয় না। ওয়েল মাই ডিয়ার—

আঃ, ছাড়ুন! আমি এ দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে কোনদিন দেখিনি। এত নীচ প্রবৃত্তি আপনার! আপনি না ভদ্রলোক!!

ভদ্রলোক! ভদ্রলোক আবার এ দুনিয়ায় আছে নাকি? মিথ্যে সিন ক্রিয়েট করে কোন লাভ হচ্ছে না স্বপ্না। বাগানের বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে—

আপনি আমায় চিনতে ভুল করেছেন, ডাঃ চৌধুরী। আমি সে-জাতের মেয়ে নই। আপনি এখান থেকে যান, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড় করব।

বেশ, তাই কর। এরকম অভিনয় আমি জীবনে অনেক দেখেছি। মেয়েরা প্রথম প্রথম এরকম বলেই থাকে। তারপর—এস—

ডাঃ চৌধুরী স্বপ্নার ডানহাতটা ধরে ওকে বাগানের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। স্বপ্না আপ্রাণভাবে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সচেষ্ট হয়। ঠিক এই সময়—

দাঁড়ান—

চমকে মুখ ফেরালেন ডাঃ চৌধুরী। ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শেখর।

ভয় পেলেন নাকি? অপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মত ক্ষমতা আমি রাখি। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলার সামনে এতটা অসংযত হতে চাই না। গেট আউট—বেরিয়ে যান এখান থেকে—

কি একটা বলতে গিয়েও থামলেন ডাঃ চৌধুরী। তারপর দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলেন। অশ্রু-সজল চোখে স্বপ্না শেখরের দিকে

তাকাল।

আপনি না এসে পড়লে····

কক্‌লেটের পরিণাম যে এরকম হবে সে ইঙ্গিত আমি সকালেই দিয়েছিলাম। আসুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

এই অদ্ভুত লোকটির দিকে তাকাতে সংকোচ হচ্ছে স্বপ্নার। ও নত-দৃষ্টিতেই যন্ত্র-চালিতের মত শেখরকে অনুসরণ করল।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেখর নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিল। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে এখান থেকে বিদায় নেবে।

শেখরবাবু!

শেখর অবাক হয়ে দেখল স্বপ্না এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে।

একি, আপনি—এত সকালে?

একটা কথা বলতে এলাম।

ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে আসুন!

স্বপ্না ঘরের মধ্যে এল। সারারাত্রি বোধহয় ঘুম হয়নি। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। ও নরম গলায় বলল, আমি কিছু বলতে চাই আপনাকে।

বলুন!

কালকের ঘটনাটা আপনি দাদুর কাছে প্রকাশ করে দেবেন না। আর···

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিস চ্যাটার্জী, এতখানি নীচতা আমার নেই।

আর···আর, আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার এতদিন আমি করে এসেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন।

শেখরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।—ওকথা বলবেন না। আমি আপনাদের মাইনে-করা ভৃত্য মাত্র, আমার কাছে এতটা নীচু হওয়া আপনার সাজে না। তাছাড়া আমি যখন চলে যাচ্ছি!

চলে যাচ্ছেন কেন ?

কাল আপনি আমায় বরখাস্ত করেছেন। আজ সকালেই আমার চলে যাওয়ার কথা।

শেখরের একটা হাত চেপে ধরে স্বপ্না বলল, না, আপনার যাওয়া হবে না। আমি যা বলেছি সব মিথ্যে। আপনি থেকে যান শেখরবাবু !

থেকে যাব, কিন্তু···

আমায় ভাল হবার একটু সুযোগ দিন !

আমি আপনাকে সুযোগ দেব !

চোখ ছলছলিয়ে উঠল স্বপ্নার। ভেজা গলায় বলল, আমি ধীরে ধীরে কোথায় নেমে যাচ্ছিলাম নিজেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু কালকের ঘটনার পর আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। আমি যে এত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলাম, এর জন্য শুধু কি আমিই দায়ী—বলুন—বলুন আপনি ?

কি বলবে শেখর ? এই খামখেয়ালী মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার কি ভাষা তার আছে ?

ঘণ্টা খানেক পরে।

নিজেকে অনেকটা স্বাভাবিক করে এনেছে স্বপ্না। এখনও বাগানের চারিধারে ঘুরে-ফিরে দেখছে। পুরানো জিনিসকে নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছে। নানা গাছের জন্ম-ইতিহাস বা তার গুণাগুণ সম্বন্ধে বুঝিয়ে ওকে বলছে শেখর।

একসময় স্বপ্না বলল, আপনি গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে এত জানলেন কিভাবে ? অনেক বই-টই পড়েন বুঝি ?

নির্লিপ্ত গলায় শেখর বলল, আমি বোটানিতে এম. এ.। M. Sc.

আপনি এম. এ.। তবে যে সেদিন বললেন আই. এ. ?

মুখে যা-ই বলুন, আমি এম. এ. পাশ শুনলে আপনার দাদু আমায় চাকরি দিতেন না।

কিন্তু আপনি তো কত ভাল কাজ পেতে পারেন ! এখানে পড়ে থেকে কেন মিথ্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন ?

নষ্ট করিনি তো, বরং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।—বেলা বাড়ছে, আসুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কয়েক দিন কেটে গেছে এরপর।

কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে স্বপ্নার মধ্যে। সেই স্বেচ্ছাচারিতা ও দর্পিত ভাব আর নেই। ওর হাব-ভাব ও চালচলনে অনাদিনাথ ও স্নেহপ্রভা অবাক হয়েছেন।

আজ রবিবার। মন বেশ পরিচ্ছন্ন স্বপ্নার। অনেকক্ষণ বাগানে থাকা যাবে। কলেজের তাড়া নেই। আজকাল প্রতিদিনই আলীপুরের বাগানে না গেলে কেমন যেন বিশ্রী মনে হয় ওর। এ কি শুধুই ফুলের আকর্ষণ ? শেখর, যাকে সে মানুষ বলেই মনে করত না, প্রকারান্তরে ঘৃণাই করে এসেছে যাকে, আজ তাকে একদিন না দেখলে ওর মন এত উতলা হয়ে ওঠে কেন ? ইলা ঠিকই বলেছিল —অ্যাপেলো। গ্রীক-ভাস্কর্যের চির-সুন্দর মূর্তি অপরূপ অ্যাপেলো।

একটা পলাশ গাছতলায় পাশাপাশি বসে আছে দ'জনে। চারিধারে অজস্র গন্ধহীন পলাশ ছড়ানো।

একটা ফুল তুলে নিয়ে স্বপ্না বলল, কি সুন্দর দেখতে, না ?

ঠিক তোমার মত। সুন্দর ও মসৃণ।

তাই বোধহয় আমারই মত গন্ধহীন।

মৃদু হেসে শেখর বলল, তুমি গন্ধহীন নও স্বপ্না। তোমার গন্ধ চাপা পড়ে ছিল—তুমি হলে পলাশগন্ধা।

স্বপ্না শেখরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, দাদু আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বিয়ে ! স্বপ্ন টুটে গেল শেখরের। স্বপ্নার এই আচমকা কথার উত্তর সে অন্যমনস্ক ভাবেই দিল, কিন্তু তাঁর কাছে কোন্ সাহসে

আমি কথাটা পাড়ব? লক্ষ টাকার সঙ্গে নয়া পয়সার মিল তিনি কি মেনে নেবেন?

টাকাই কি সব? তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি এসব কি কিছুই দেখবেন না তিনি?

না। তিনি দেখবেন টাকা। তোমাকে বিয়ে করার অন্যতম যোগ্যতাই হল ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স।

কিন্তু তুমি জানো না বোধ হয়, দাদু প্রথম জীবনে অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার অবস্থা উপলব্ধি করবেন!

দু'হাত দিয়ে স্বপ্নাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শেখর বলল, উপলব্ধি করলেও একজন মাইনে-করা কর্মচারীর হাতে নিজের নাতনীকে তুলে দিতে আজ তাঁর আত্মসম্মানে বাধবে।

বাঃ, মার্ভেলাস—এ যে রীতিমত বৃন্দাবন লীলা দেখছি!

চমকে দু'জনে মুখ তুলল। ডাঃ চৌধুরী মিঃ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ওদের প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। স্বপ্না সরে এল শেখরের কাছ থেকে।

তারপর স্বপ্না দেবী, সেদিন তো চমৎকার সীতা-সাবিত্রীর অভিনয়টা করলেন! অথচ তলায় তলায় রাধিকার মানভঞ্জন পালাটা বেশ জমিয়ে তুলেছেন দেখছি!

তীব্রকণ্ঠে স্বপ্না বলল, থামুন! আপনি আবার কোন্ সাহসে এখানে এসেছেন? বেরিয়ে যান এখান থেকে!

ডাঃ সেন হাসলেন।—নিশ্চয়ই! বেরিয়ে নিশ্চয়ই যাব। তবে বেরিয়ে গিয়েই আপনার দাদুকে সবিস্তারে জানাতে হবে সমস্ত কিছু—দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না তো!

কথাটা শেষ করেই ডাঃ চৌধুরী মিঃ গুপ্তকে নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

স্বপ্না শেখরের দিকে তাকাল।

সন্ধ্যার অনেক পরে। স্বপ্না নিজের ঘরে বসে নোটের খাতা

মুখস্ত করছিল। অনাদিনাথ ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বপ্নার বুকের মধ্যে দুরু‌দুরু করে উঠল। ও কোনক্রমে নিজের মনকে সংযত করে তাঁর দিকে তাকাল।

অনাদিনাথ একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ।

কাঁপা হাতে তাঁর কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে নীরবে পড়ল।

চিঠিটা পড়ে সমস্ত বুঝতে পেরেছ বোধ হয়? সৌরভ ৮ই মুঙ্গের থেকে আসছে। বিয়ের আগে সে তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে রাখতে চায়।

এ সমস্ত আমার ভাল লাগছে না দাদু।

ভাল না লাগার কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই?

তুমি আমাকে স্বাধীনভাবে মানুষ করেছ। এ ব্যাপারে আমার স্বাধীন মত দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় হবে না?—আমি ওখানে বিয়ে করব না।

হুঁ! প্রবীর যা বলে গেল তাহলে তা মিথ্যে নয়? শেখর, ঐ স্কাউন্‌ড্রালটাকে নিয়ে একটা স্ক্যাণ্ডেল করতে লজ্জা হল না তোমার?

উনি শিক্ষিত লোক, এম. এ. পাশ করেছেন।

আভিজাত্যের মাপ-কাঠিতে এম. এ. পাশই সব নয়। ব্যাপারটা আরো বেশিদূর এগিয়ে যাক, তা আমি চাই না। তাই আজ বিকেলে তাকে বরখাস্ত করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল স্বপ্না। দাদু!

ভবিষ্যতে যাতে তোমার সঙ্গে তার আর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। এ নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তুমি সৌরভকে সহজভাবে গ্রহণ করবে এই আমার ইচ্ছে।

একটা দুঃসহ রাগ, একটা চাপা কান্নায় থর-থর করে কেঁপে উঠল স্বপ্নার সারা শরীর। মুখের গোড়ায় অজস্র কথা ভীড় করে এল—কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করল না স্বপ্না। অরণ্যে রোদন করে কি লাভ! ও নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

অনাদিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন কেটেছে আরো।

একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে স্বপ্না।

বেয়ারা এসে জানাল অনাদিনাথ ওকে ডাকছেন।

স্বপ্না মন্থরপদে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অনাদিনাথের ঘরে এল।

ওকে দেখেই তিনি বললেন, আজ সৌরভ আসছে, তোমাকে স্টেশনে যেতে হবে।

স্বপ্না কিছুই বলল না।

তিনি আবার বললেন, কাল রাত্রি থেকে আমার ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে, নইলে আমিই যেতাম। তাছাড়া আমার ইচ্ছে তুমি তাকে রিসিভ কর। সাড়ে দশটায় ট্রেন শেয়ালদা স্টেশনে আসছে। যাও, গিয়ে তৈরি হয়ে নাও।

স্বপ্না কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিছু বলেই বা লাভ কি!

লোকে-লোকারণ্য।

শেয়ালদার পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিরক্তচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে প্রবেশ করল প্ল্যাটফর্মে।

স্বপ্না মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা বোধ করে। তার প্রতি এ কি ঘোর অবিচার! কিন্তু শেখর—এতদিনে সে কি পারত না তার খোঁজ নিতে! পারত না সে কি কোথাও থেকে রিং করতে।

অগণিত যাত্রী নেমে আসছে ট্রেনের প্রতিটি কামরা থেকে। জনস্রোত ক্রমেই এগিয়ে চলেছে সামনের গেটের দিকে। স্বপ্না ভেবে পায় না, যে লোকটিকে ও জীবনে কোনদিন দেখেনি, যার মুখ-চোখ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তাকে ও কিভাবে রিসিভ করবে? এর উত্তর অবশ্য স্নেহপ্রভা দিয়ে দিয়েছেন, ওর ছবি মুঙ্গেরে পাঠান হয়েছে। কাজেই সৌরভই ওকে খুঁজে বার করবে।

নিচেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকে স্বপ্না।

ভিড় পাতলা হয়ে আসছে।

কিন্তু ও কে এগিয়ে আসছে! শেখর না? বিস্ময়ে হতবাক স্বপ্না।

শেখর ও সামনে এসে দাঁড়াল।

একি, তুমি !!

মৃদু হেসে শেখর বলল, চল, বাইরে যাওয়া যাক।

গাড়িতে এসে বসল দুজনে।

বিহ্বলকণ্ঠে স্বপ্না বলল, তুমি এখানে কি করে এলে? চল আমরা কোথাও চলে যাই! এই ট্রেনেই মুঙ্গের থেকে একজনের আসবার কথা আছে! তার সঙ্গে আমার—

বিয়ে ঠিক হয়েছে।

ঠাট্টা করছ! দোহাই তোমার, আমায় কোথাও নিয়ে চল! আর আমি ওদের কাছে ফিরে যেতে পারব না।

কি হচ্ছে ছেলেমানুষের মত? বাড়ি চল, এবার ঠিক দাদু আমার কথায় রাজী হবেন।

কি বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি। ড্রাইভার, চল।

গাড়ি সচল হল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শেখরের দিকে তাকিয়ে রইল স্বপ্না তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর।

বুঝেছি···এবার বুঝতে পেরেছি।—এতদিন ধরে আমায় পরীক্ষা করা হচ্ছিল বুঝি?

ঠিক তা নয়। সৌরভ বলল, ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পরই বাবা আমাকে তোমার দাদুর কাছে পাঠালেন। এখানে এসে দেখলাম কেয়ার-টেকার নির্বাচন-পর্ব চলেছে। ছদ্মবেশে কিছুদিন কাটাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। শেখর আমার ডাক-নাম। তারপর যা হয়েছে, কিছুই তোমার অজানা নয়।

পোর্টিকোতে দ্রুত পদচারণা করছিলেন অনাদিনাথ। বার বার

বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো ওয়ালক্লকটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় নিঃশব্দ গতিতে প্যাকার্ডখানা তাঁর সামনে এসে থামল। গাড়ির ভেতর থেকে পর পর নেমে এল সৌরভ ও স্বপ্না।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন অনাদিনাথ, তারপর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি—!

সৌরভ তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার চিঠি পেয়েই বাবা আমাকে এখানে পাঠালেন।

ঘষা কাচের মত অনাদিনাথের চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে এল।

একটা চিঠিও দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে। এই যে—

সৌরভ পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। বোবা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে কেটে গেল। ক্রমে দৃষ্টি তুললেন অনাদিনাথ। স্বপ্না ও সৌরভকে পরিষ্কারভাবে দেখে নিলেন একবার। তারপর প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, শালা, আমায় খুব ঠকিয়েছে তো!

পাঁচ

সন্ধ্যা নামছে।

কুলু-উপত্যকার ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসছে পিঙ্গল সন্ধ্যা।

অক্টোবর মাস। তবু কাল রাত্রে বরফ পড়েছে। তার চিহ্ন রয়েছে এখানে ওখানে, ফার ও পাইন গাছগুলোর ওপর। দেবাশীষ গ্রেট কোটের কলার ভাল করে তুলে দিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে চলেছে নিজের বাংলোর দিকে। ছ'মাসের ওপর হল এখানে এসেছে ও। কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচল প্রদেশে যে হাইওয়ের কাজে নেমেছেন, তারই জোনাল সুপারভাইজারের পদ দিয়ে দিল্লী থেকে ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে দেবাশীষ খুশি হয়নি। শীত-কাতুরে লোকের পক্ষে দিল্লীই বরদাস্তের বাইরে। তারপর আবার কুলু ভ্যালি—ওখানকার রক্ত জমাট-করা শীতের কথা কার আর অজানা!

দেবাশীষ বলেছিল নিজের ওপরওয়ালাকে, শুনেছি ওখানে ভীষণ শীত! আমি···; ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ মিরানী বলেছিলেন, হিমালয়ের প্রায় কোলে, শীত একটু বেশি হবেই। তবে ওখানকার অপূর্ব দৃশ্যাবলী তোমাকে শীতের কথা ভুলিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত তুমি ওখান থেকে আসতেই চাইবে না।

ঠিকই কিন্তু বলেছিলেন মিঃ মিরানী। এখানকার নৈসর্গিক শোভায় দেবাশীষ নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যাঁরা এখানে আসেন, কাউকে ঠকতে হয় না। অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী এই কুলু-উপত্যকা।

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচটা এখনো অতিক্রম করেনি, অথচ অন্ধকার কত ঘন হয়ে উঠেছে। নিজের বাংলোর সামনে পেঁছে

দেবাশীষ সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল নিজের আবাসস্থলের দিকে। সামনে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা বাগান। আগে যিনি এখানে ছিলেন তাঁর ফুলের শখ ছিল।

দেবাশীষ বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়ল। নাথো এসে দরজা খুলে দিল। বছর পনেরোর পাহাড়ীয়া ছেলে। কুলীদের মধ্য থেকেই ছেলেটি সংগৃহীত হয়েছে, দেবাশীষের কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

ঘরে এসে গ্রেট কোট খুলতে খুলতে নাথোকে এককাপ কফি আনতে বলল। অনেক কাজ জমে গেছে। বিশেষ করে কালকের ডাকে দিল্লীতে প্রোগ্রেস রিপোর্ট না পাঠালেই নয়। সিগারেটের টুকরোটা ফায়ার প্লেসের মধ্যে ফেলে দিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসল।

মিনিট দশেক পরে নাথো কফি নিয়ে এল।

কাপ রেখে চলে না গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল টেবিলের পাশে।

দেবাশীষ কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, কিছু বলবি?

—আমি বাড়ি যাব বাবু!

নাথো রোজই খাওয়া-দাওয়া সেরে ন'টা আন্দাজ বাড়ি যায়। কাছেই বাড়ি।

—আজ এত তাড়া কিসের?

—দুপুরে আমার বাবা বাড়ি এসেছে। তাড়াতাড়ি যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছে বাবু।

দেবাশীষ শুনেছিল নাথোর বাপ পাঠানকোটে কাজ করে। বাড়ি আসে বছরে একবার। ওকে ছুটি দিয়ে দিল। নাথো যাবার আগে রাত্রের খাবার কোথায় ঢাকা আছে বলে গেল। আর দিয়ে গেল একখানা চিঠি। আজকের ডাকে এসেছে।

দেবাশীষ খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করল। কলকাতা থেকে পিসিমা লিখেছেন। বলতে গেলে ওর একমাত্র আপনজন। বাবা

অবশ্য আছেন। তবে তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তিনি দেবাশীষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠলে, মা-মরা ছেলেটিকে পিসিমা কাছে টেনে নিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম দিকের দিনগুলি পিসিমাকে অবলম্বন করেই কাটিয়েছে দেবাশীষ। আর আজ ওকে অবলম্বন করেই পিসিমার দিন কাটছে।

অনেক কথা লিখেছেন পিসিমা। উনি নাকি ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছেন। স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গেছে। কবে আছেন কবে নেই—এইবেলা দেবাশীষ যদি বিয়ে না করে তাহলে আর বৌ-এর মুখ দেখে যেতে পারবেন না। দেবাশীষ হেসে ফেলল। অন্যান্য সমস্তই ভূমিকা মাত্র। আসল কথা হল এই। বেশ কিছুদিন থেকে ওর বিয়ের জন্য তিনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। অবশ্য এবার বিয়ে করে ফেললেই হয়। চিঠিখানা একপাশে সরিয়ে রেখে আবার কাজে মন দিল।

একসময় দেয়াল-ঘাড়তে সশব্দে আটটা বাজল।

অনেকক্ষণ কাজ করা হয়েছে। রিপোর্ট মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেবাশীষ হাই তুলল। ক্লাব বা বন্ধু-বান্ধব থাকলে কোনই অসুবিধা হত না। এখানে সেরকম কিছুই নেই।

ফায়ার প্লেসের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল—শুনতে পেল বাইরে বাহাদুর কার সঙ্গে কথা বলছে। বাহাদুর দেবাশীষের নেপালী দারোয়ান। কথাবার্তা বেশ উচ্চগ্রামেই চলছে।

যেন ঝগড়ার পূর্বাভাস। কি হল আবার? বাহাদুর আবার কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তোলার উপক্রম করল?

গরম ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে এল। দু'জন দীর্ঘকায় ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত লোকের সঙ্গে বাহাদুর কথা বলছে। তার বেশ উত্তেজিত ভঙ্গী। ওকে দেখে আগন্তুকরা এগিয়ে এল।

—কি হয়েছে ?

—একজন এইমাত্র আপনার বাড়িতে ঢুকেছে। আমরা তাকে খুঁজছি।

—এখানে! আপনারা ভুল করছেন। আমার এখানে কেউ আসেনি। কেউ এলে দারোয়ানের চোখে কি পড়তো না? চোর নাকি—

চোর নয়। তবে আপনি যখন বলছেন…আমাদের কিন্তু মনে হল এই বাড়িতেই ঢুকেছ—

—হয়তো পাশের বাড়িতে ঢুকেছে। পর-পর বাংলোগুলোকে একই রকম দেখতে, অন্ধকারে আপনারা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।

আগন্তুক দু'জন আর কথা বড়াল না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বারান্দা থেকে নেমে গেল। দেবাশীষ বাহাদুরকে শান্ত মেজাজে সকালের সঙ্গে কথাবার্তা বলার উপদেশ দিয়ে ঘরে ফিরে এল। এই রাস্তার বাংলোগুলি একই রকম দেখতে, তাই আগেও কয়েকবার লোকে ঠিকানা গুলিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু, একি—।

ঘরে পা দিয়েই দেবাশীষ হতবাক হয়ে গেল। ফায়ার প্লেসের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে একটি মেয়ে আগুনে হাত গরম করে নিচ্ছ। একেই আগন্তুকদ্বয় খুঁজছিল নাকি? নিশ্চয় তাই। পায়েয় শব্দে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। মুখের সর্বত্র সংকোচ আর ভয় মিশে রয়েছে। দেবাশীষ দেখল, গায়ে একসুতো গরম কাপড় নেই। সুতী কাপড়ের শালোয়ার আর পাঞ্জাবি পরে রয়েছে। ধারালো মুখ, টকটকে গায়ের রং। একমাথা অবিন্যস্ত চুল। ক্লান্ত চোখ দুটির তলায় গভীর কালিমা।

দ্রুতগলায় মেয়েটি উদর্তে বলল, ওরা চলে গেছে ?

—হ্যাঁ। কিন্তু…

—আরেকটা উপকার করুন—পুলিশে একটা খবর দিন দয়া করে!

—পুলিশ! ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—আমি…আমি আপনাকে…

মেয়েটি আর কিছু বলতে পারল না। বসে পড়ল, তারপর এলিয়ে পড়ল মাটিতে। দেবাশীষ দ্রুত এগিয়ে এল। মূর্ছার মত হয়েছে। এখন কি করবে ও—বাহাদুরকে ডাকবে নাকি? কিন্তু তাকে বোধহয় ডাকা ঠিক হবে না। এখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওই লোক দুটো এর পিছু নিয়েছিল। পালাতে পালাতে এখানে এসে পড়েছে। তাই পুলিশের সাহায্য চাইছে।

এইভাবে ঠাণ্ডা মাটিতে পড়ে থাকতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। একটু ইতস্ততঃ করে দেবাশীষ দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। র‍্যাগটা টেনে দিল গায়ের ওপর। কয়েক মিনিট পরেই চোখ মেলে তাকাল সে। অসম্ভব দুর্বল বলেই মনে হচ্ছে।

দ্রুত গলায় বলল দেবাশীষ, উঠবেন না। মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থ।

শীর্ণ গলায় সে বলল, পুলিশে খবর দিয়েছেন—দেননি? ভালই করেছেন। কাল সকালেই আমি চলে যাব।

—আপনি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছেন! আমায় বলুন, যদি কোন সাহায্য…

—ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে, রাতের মত আশ্রয় দিয়েছেন এতেই আমি কৃতজ্ঞ। এরপর আর কোন…

—কুণ্ঠিত হবেন না। কি হয়েছে আমার খুলে বলুন! লোক-দুটো কারা?

মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, অমৃতসরে আমাদের বাড়ির পাশে ওরা থাকত।

তারপর….

এবার সে যা বলল তাতে কোন নূতনত্ব নেই! এরকম কাহিনী হামেশাই শোনা যায়। তবে এই কাহিনীর মর্মস্পর্শী পরিণতি

দেবাশীষের মনকে নাড়া দিয়েছে। মেয়েটির নাম ঊষা—ঊষা খান্না। অমৃতসরে তাদের পাশের বাড়িতেই থাকত জগজিৎ। ঊষার আলাপ ছিল তার সঙ্গে। জগজিৎ প্রায়ই নানা কথা বলত—ঊষার ভাল লাগত না। একদিন বাড়িতে সামান্য ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হবার পর সে যখন নির্জন একটা পার্কে গিয়ে বসে ছিল, তখন জগজিৎ একজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। ঊষা কিছু বলার আগেই কি যেন ঘটে গেল—জ্ঞান হবার পর অনুভব করল ট্রেনের মধ্যে রয়েছে।

জগজিৎ আর তার সঙ্গী ছাড়া কামরায় আর কেউ ছিল না। প্রচুর কান্নাকাটি করেছে ঊষা, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ওরা তাকে এনেছে এখানে। কেটে গেছে এখানে দিনের পর দিন। পালাবার সমস্ত রাস্তা যে বন্ধ করে দেওয়া ছিল তাই নয়, গরম কাপড়-চোপড় গা থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজ হঠাৎ সুযোগ পেয়েই, শীতকে উপেক্ষা করে পালিয়েছে ওখান থেকে।

বাকীটা দেবাশীষের অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। পাখী উড়ে গেছে দেখেই জগজিৎ আর তার সঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়ে। ঊষা হয়তো বারান্দার কোন অন্ধকার কোণে লুকিয়ে ছিল। গলার আওয়াজ পেয়ে ও যখন বাইরে আসে তখনই খোলা দরজা দিয়ে ঊষা ভেতরে চলে যায়।

কয়েক মিনিট দেবাশীষ কিছু বলতে পারল না। ঊষা নিজের কাহিনী শেষ করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। নীরবতাকে বারংবার ভাঙতে থাকে দেয়াল-ক্লকের টিক টিক শব্দ। টিক টিক শব্দ এগিয়ে নিয়ে চলেছে সময়ের গতিবেগকে।

শেষে দেবাশীষ কথা বলল,

ঠিকানাটা পেলে আমি আপনাকে অমৃতসরে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি।

—আর তা সম্ভব নয়, বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না আমি।

—এ লজ্জা আপনাকে জয় করতে হবে। আমার বিশ্বাস তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন।

ঊষা নিরুত্তাপ গলায় বলল, একেই তাঁর সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওখানে গিয়ে তাঁকে আর ছোট করতে চাইনা।

এই দৃঢ়চেতা মেয়েটির জন্য দেবাশীষের মন আবার দুলে উঠল।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল, রাত হয়েছে। এবার ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই দেবাশীষ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পাশের ঘরে এসে মনে হল, খাওয়ার কথা বলা উচিৎ ছিল। সারাদিন হয়তো না খেয়েই আছে। দুর্বলতার কারণ বোধ হয় তাই। কিন্তু,—আবার ফিরে গিয়ে বলতেও কেমন সংকোচ হতে লাগল।

একটা লম্বা বেতের সোফার ওপর বসল। এতে শুয়েই রাত কাটাতে হবে। ও একলা মানুষ, কাজেই বাড়িতে দুটো বিছানা থাকার কথা নয়। অবশ্য খান-দুই বাড়তি কম্বল আছে। দেবাশীষ অবাক হয়ে ভাবছে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবে তা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

সাড়ে ছ'টার আগে ঘুম ভাঙল না।

তাড়াতাড়ি উঠে গরম ড্রেসিং-গাউনটা গলিয়ে নিয়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল দেবাশীষ। খড়খড়ি তুলতেই কুয়াশা যেন ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে এল। এখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে এল। ঘরে আলো জ্বলছে। ঊষা বিছানার ওপর বসে আছে পা ঝুলিয়ে। শীতে কাঁপছে। সুন্দর—মিষ্টি সৌন্দর্য মুখের রেখায় রেখায়। অনিন্দ্য দেহ-সৌষ্ঠব।

দেবাশীষ বলল, এভাবে বসে থাকবেন না। র‍্যাগটা গায়ে জড়িয়ে নিন।

উষা মুখ নত করে বলল, এবার আমি যাব।

—এই ঠাণ্ডায়! তাছাড়া অনির্দিষ্টভাবে যাবেনই বা কোথায়?

—কোথাও একটা যাব।

তার গলায় অস্থিরতা প্রকাশ গেল, না গেলে তো চলবে না। আর, আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না।

—আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—কিন্তু...

—মিথ্যে সংকোচ করছেন। আমাকে বন্ধু বলে মনে করুন। এখন আপনি সত্যিই সুস্থ নন। যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে সুস্থ থাকার কথাও নয়! এই অবস্থায় যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এইভাবে কতদিন চলতে পারে?

—যতদিন না আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করছেন। তারপর একান্তই যদি অমৃতসর যেতে না চান, আপনাকে দিল্লী নিয়ে যাবো।

—দিল্লী!

—ওখানকার এক বিখ্যাত মহিলা কেন্দ্রের অধ্যক্ষার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আপনার একটা কাজের ব্যবস্থা ওখানে হয়ে যাবে।

নাথো এই সময় ঘরে এল।

তার বিমূঢ় অবস্থা দেখে মৃদু হেসে দেবাশীষ বলল, হাঁ করে দেখছিস কি? কফি আর জলখাবার নিয়ে আয় চট করে।

দশটা আন্দাজ সময় দেবাশীষ কাজে বেরুল। নিজের জীপটা কাল অফিসেই রেখে এসেছিল। বাংলো থেকে অফিসের দূরত্ব আটশ' গজের বেশি নয়। ওখান থেকে জীপ নিয়ে, মাইল ছয়েক দূরের ওয়ার্ক-সাইটে গেল।

ক্যাটার পিলারের সাহায্যে এখন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে। চারিধারে ভীষণ ব্যস্ততা। দেবাশীষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত তদারক করল। রোল-করা ম্যাপটা খুলে এখানে রাস্তা কতটা বাঁক

নেবে সে সম্পর্কে পরামর্শ করল ওভারশীয়ার দেবীদয়ালের সঙ্গে।

এইভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দেবাশীষ আবার জীপে এসে বসল। চারটের আগে কোনদিনই বাংলোয় ফেরে না। আজ কেমন যেন—ঊষার আগমনেই এই ব্যতিক্রম কি? নিজের মনকে ভালভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করে দেবাশীষ। ওই পথভ্রষ্টা মেয়েটি এই ক'ঘণ্টাতেই যে ওর মনে প্রভাব করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছিল। বাজারে জীপ থামিয়ে কিছু গরম কাপড়-জামা কিনল ঊষার জন্যে। বিল মিটিয়ে প্যাকেট হাতে নিতেই কেমন অদ্ভুত লাগল। এর আগে কখনও কোন মেয়ের জন্যে কিছু কেনেনি। ঠোঁটের কোণে একটু করো হাসি খেলে ওর।

ক্রমে বাংলোর সামনে পৌঁছল। গাড়ির আওয়াজে ঊষা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। যেন অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ ধরে। জীপ থেকে নেমে থমকে দাঁড়াল দেবাশীষ। অদ্ভুত একটা অনুভূতি মনের মধ্যে চিনচিন করে উঠল। কাল এই সময় ঊষার কথা ওর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। অথচ আজ—!!

দেবাশীষ বারান্দায় উঠে বলল, আপনার জন্যে কিছু গরম কাপড় নিয়ে এলাম!

—গরম কাপড়!

বিস্ময়ে সীমা থাকে না ঊষার। লোকটির অদ্ভুত স্বভাব অবশ্য কাল থেকেই লক্ষ্য করেছে।—কি দরকার ছিল গরম কাপড়ের?

—ছিল বইকি! আমার চোখের সামনে আপনি ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকবেন তা হতে পারে না।

দু'জনে ঘরে এল।

—বলে রেখেছি, বাহাদুরের বৌ আজ রাত্রে আপনার কাছে শোবে।

—আপনার সব দিকেই নজর আছে দেখছি!

—আপনি আমাকে কি জগজিৎ-এর সমগোত্রীয় মনে করেন?

ঊষার হাত থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা পড়ে গেল দু'চোখের দৃষ্টিতে অনুযোগের ঘনছায়া। অনুতাপে ভরে গেল দেবাশীষের মন। কেন বলতে গেল কথাটা? না বললে তো কোন ক্ষতি ছিল না!

বিকেল ও সন্ধ্যা কেটে গেল একরমকভাবে। আহার-পর্বও শেষ হল নীরবে। তারপর শুতে গেল যে-যার বিছানায়। বাহাদুরের বৌ জানকী ঊষার ঘরের মাটিতে বিছানা পেতে নিয়েছে। দেবাশীষ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। কালকের মত আজও বেতের সোফার ওপর রাত কাটাতে হবে। কম্বলটা গায়ে তুলে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দেবাশীষের। কেমন শীত-শীত করছে। গা থেকে কম্বলটা পড়ে গেছে নিচে। হাত বাড়িয়ে কম্বলটা তুলে নিতে গিয়েও থামল। দুটো ঘরের মধ্যেকার দরজায় ঊষা এসে দাঁড়িয়েছে। ফায়ার প্লেসের চাপা আগুনের আলোয় তাকে ছায়ার গড়া মনে হচ্ছে। ঊষা এগিয়ে এসে ওধারের দরজা খুলে বারান্দায় চলে গেল। দেবাশীষও উঠে পড়ল। ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপিয়ে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ঊষা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝকিয়ে উঠছে বরফের কণাগুলি। দেবাশীষ ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। অল্প একটু শব্দ হয়েছিল বোধ হয়। চমকে মুখ ফেরাল ঊষা। অবাক হয়ে গেল দেবশীষকে দেখে।

—আপনি জেগে ছিলেন?

—ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আপনি উঠে এলেন যে?

মুখ নিচু করে ঊষা বলল, ঘুম আসছে না। ঘুরে-ফিরেই আপনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

—আমার কথা?

—আমার জন্যে কত অসুবিধায় পড়েছেন! কত কষ্ট হচ্ছে!

—কই, না তো?

—আমি জানি হচ্ছে।

—কেন ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন?

—কিন্তু কেন আপনি আমার জন্যে এত অসুবিধা সহ্য করবেন?

—মনুষ্যত্বের দিক থেকে আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। আসুন, এবার ভেতরে যাওয়া যাক। এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা।

ওরা ঘরে ফিরে এল।

—আমি এবার শুতে যাই।

ঊষার গলার আওয়াজ ভেজা। বিস্মিত দেবাশীষ দেখল তার চোখে জল।

—একি, আপনি কাঁদছেন?

ঊষা কোন উত্তর দিল না। চোখ মুছতে মুছতে পাশের ঘরে চলে গেল। নানা চিন্তা দেবাশীষের মনে ওঠা-নামা করতে লাগল। ক্রমেই বিচিত্র সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

কয়েকদিন পরে সূর্যের আলোয় চারিধার ঝলমল করছে।

দেবাশীষ ঘণ্টা-তিনেক আগে কাজে বেরিয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঊষা বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। জানকী নিজের ঘরে গেছে। রোদ উঠেছে বলে নাথো উঠানে বসে কাচাকাচির কাজ সেরে নিচ্ছে। দেবাশীষ কখন ফিরবে কে জানে! অদ্ভুত হৃদয়বান লোক। পাঞ্জাবী ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ঊষা আগে মেলা-মেশা করেনি। বাঙালীদের সম্বন্ধে তো একটা ভ্রান্ত ধারণাই ছিল এ যাবৎ।

এই রকম নিরালা অবকাশে অতীতকে বড়ো বেশি করে মনে পড়ে। কলেজের পড়া অবশ্য শেষ করতে পারল না। জলন্ধরে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল! প্রবল ঝড় যেন সমস্ত কিছুকে ওলটপালট করে দিল। আর এই ওলট-

পালটের জোয়ারে ডুবন্ত ঊষাকে নিশ্চিত তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে দেবাশীষ। এক অজানা হিল্লোল হঠাৎ তার মনকে রসাপ্লুত করে তুলল।

—কেমন আছো ?

চমকে মুখ ফেরাতেই বজ্রহাতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল ঊষা। বারান্দার এক ধারে দাঁড়িয়ে নির্বিকারমুখে সিগারেট টানছে জগজিৎ।

—ভেবেছিলে, আমরা মোটেই জানতে পারিনি তুমি এখানে আছো ?

কেন এখানে এসেছেন ? আপনার কি ধারণা আমি আবার ফিরে যাব ?

—নির্বোধ লোকটা তোমার স্বরূপ জানে তো ?

—তাঁকে আমি সব বলেছি। তিনি আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল।

—তাই নাকি ! কিন্তু তোমার জন্যে ওই সহানুভূতিশীল লোকটা পুলিশের হাতে পড়ুক তা নিশ্চয় তুমি চাইবে না ?

—পুলিশ ! ঊষার গলা চিরে আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল।

চিবিয়ে চিবিয়ে জগজিৎ বলল—আমরা এত রিস্ক নিয়ে পাঞ্জাব থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। সেই তুমি হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব, তা তো হতে পারে না ! তোমার বাবাকে একটা উড়ো টেলিগ্রাম দেওয়া হবে। তিনি আসবেন। তারপর নিশ্চয় বুঝতে পারছো, তোমার ওই সহানুভূতিশীল আপনজন তোমাকে ভাগিয়ে আনার অপরাধে পুলিশের হাতে যাবেন।

ভয়ে একেবারে মিঁইয়ে গেল ঊষা।

—ভাবনায় পড়ে গেলে দেখছি ! এর সরল সমাধানও তো রয়েছে। এখুনি আমার সঙ্গে চলে গেলে ভদ্রলোক রেহাই পেয়ে যাবেন।

অসীম বলে ঊষা নিজেকে সংযত করে বলল, আপনার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে যাবেন, না লোক ডাকব ?

জগজিৎ-এর মুখে কদর্য হাসি খেলে গেল !

—তোমার মুখে ও সমস্ত কথা মানায় না। নাউ বিইং এ স্ট্রীট গার্ল—বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছো, তুমি তো এখন কমন প্রপার্টি। আমাকে চোখ রাঙাচ্ছো ! এখন চললাম। তবে আবার আসব।

দু'চোখ ফেটে ঊষার জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে কি ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ! কিন্তু আজকে এ বিদ্রূপকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ক্রমে কান্নার একটা তীব্র বেগ তাকে বিহ্বল করে তুলল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ফুঁপিয়ে চলল।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে জানে না।

—একি ! আবার কান্না ?

দেবাশীষ কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারেনি ঊষা।

ওড়না দিয়ে চোখ মুছে ঊষা বলল, নিজেকে আর চাপতে পারছি না।

—পুরানো কথা ভাবলেই মন খারাপ হবে। ও সমস্ত ভুলে যান। চলুন, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।

—কোথায় ?

—লোকালয় থেকে দূরে কোথাও। চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে। আজ বেড়াবার পক্ষে উপযুক্ত দিন। যাবেন ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ঊষা। বাগানের বাইরে জীপ দাঁড় করানো ছিল। দু'জনে গিয়ে বসল তাতে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা জনমানবহীন নৈসর্গিক রাজ্যে এসে উপস্থিত হল। জীব এগিয়ে চলল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

কেমন লাগছে ?

ভাল। আমি একটা কথা বলছিলাম...

বলুন ?

আমার জন্য আপনি বিপদে পড়বেন না তো? মানে পুলিশ…?

মৃদু হেসে দেবাশীষ বলল, আমি তো আপনাকে কিডন্যাপ করে আনিনি। তবে আপনি যদি পুলিশকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেন সে আলাদা কথা।

জীপ থেমে গেল। যতদূর চোখ যায় শুধু পাইন আর দেওদার। গাছের ডালে ও পাতায় গত রাত্রের ঝরা তুষার এখনও জমে রয়েছে। গলে গলে জল পড়ছে, তারই একটানা টপ্‌টপ্ শব্দ। গাড়ি থেকে নেমে দু'জনেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধব্‌ধবে সাদা পাহাড়ের চুড়াগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

শেষে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ঊষা বলল, তেমন দিন এলে আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারব বলে মনে হয়?

—না।

—কেন?

—কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পাইনি, এটা ঠিক। তবু আপনাকে যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন না।

—কেন? কেন করি না বলুন তো?

—কেন! দেবাশীষের মনের গহনে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তাই কি শুনতে চাইছে ঊষা! হয়তো,—কঠিন শাসনে নিজের ইতস্ততঃ ভাবকে দমন করেও মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য উদ্যত হল।

এই কেনর উত্তর দিতে গেলে আমায় এমন কিছু বলতে হবে, যা আপনার ভাল লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না মিস খান্না।

—মিস খান্না!

দেবাশীষ আর দ্বিধা করল না। ঊষার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, তোমার মনের ভাব বোধহয় আমি ঠিকই বুঝেছি। আর… এখন সঙ্কোচ করে লাভ নেই, প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে

ভালবেসে ফেলেছিলাম।

এক পা পিছিয়ে গেল ঊষা। স্বপ্ন টুটে গেল যেন। দেবাশীষের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন অবস্থায় সে ওর যোগ্য হতে পারে না।

—ওকথা বলবেন না। আমি তো···

—তুমি যা-ই হও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এতে চিন্তা-ভাবনারও কিছু নেই। আমি নিজের দায়িত্বেই তোমায় গ্রহণ করব।

দেবাশীষ ঊষাকে এবার নিজের কাছে টেনে নিল।

আবেগ-আপ্লুত গলায় ঊষা বলল, না না, আমাকে আর দিশেহারা করে দিও না। আমার জন্য তুমি সারাজীবন সকলের ছোট হয়ে থাকবে তা আমি চাই না।

—ছোট হয়েই বা থাকব কেন? আমরা দু'জন মাথা উঁচু করেই জীবন কাটিয়ে দেব।

আর মন বাধা মানতে চায় না। দেবাশীষের বুকে মুখ রেখে অসহায় গলায় ঊষা বলল, তোমায় কিভাবে বোঝাব কোথায় তলিয়ে গেছি আমি, কিভাবে বোঝাব তোমায়—

কথা শেষ না করেই চোখ বুজল সে। কয়েক মিনিট কেটে গেল এইভাবে। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে। রৌদ্রের শেষ রেশ ম্লান থেকে আরো ম্লান হয়ে চলেছে। এবার ফিরতে হবে।

—ঊষা···

কোন সাড়া নেই। দেবাশীষের দুই বাহুর মধ্যে তার দেহ কেমন শিথিল হয়ে পড়েছে।

—ঊষা—ঊষা···

ঊষা চোখ মেলে বলল, মাথা ঘুরে উঠেছিল। শরীরের মধ্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করছি!

—সেকি! শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে আগে বলনি কেন?

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এমন কিছু নয়। এবার ফিরে চল।

বাংলোয় ফিরে ঊষাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দেবাশীষ বলল, চুপ করে বিছানায় শুয়ে থাক। আমি এক্ষুণি ডাক্তার ডেকে আনছি।

ঊষা ব্যস্তভাবে বলল, ডাক্তার ডাক্তার মত কিছু হয়নি আমার। সাময়িক দুর্বলতা। এখন আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

—ডাক্তার আনতেই হবে। তোমার কোন টনিক বা আর কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা তা আমার জানা দরকার।

দেবাশীষ দ্রুত জীপে এসে বসল।

ডাঃ ভাললাকে চেম্বার থেকে নিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না তার। ডাঃ ভাললা পুঙখানুপুঙখভাবে পরীক্ষা করলেন ঊষাকে। দেবাশীষ তখন পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে ওখান থেকে চলে আসতে দেখেই সাগ্রহে প্রশ্ন করল, কেমন দেখলেন ডক্টর?

প্রবীণ চিকিৎসক চোখের ওপর চশমাটা বসাতে বসাতে বললেন, ভয় পাবার মত কিছু নয়। প্রাথমিক স্টেজে এরকম একটু হয়।

—প্রাথমিক স্টেজ!

—তিনমাসের প্রেগন্যান্সিকে আমরা প্রাথমিক স্টেজই বলে থাকি।

ভিজিট নিয়ে তিনি চলে গেলেন। বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল দেবাশীষ। তারপর মন্থর পায়ে প্রবেশ করল পাশের ঘরে। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকাল একবার। কারুর মুখে কথা নেই। নিশ্চুপভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

শেষে ঊষাই নীরবতা ভঙ্গ করল, তোমায় তাই বলছিলাম, তোমার যোগ্য আমি হতে পারি না।

দেবাশীষ কিছু বলল না। কি যেন ভাবছে।

—কিছু বলছো না যে? দোহাই তোমার, কিছু বল! এর চেয়ে বেশি কি আশা করেছিলে আমার কাছ থেকে? ওই পশু দুটো আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিসের স্বার্থে? আজ আমি

রিক্ত—নিঃস্ব হয়ে কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তোমার কাছে এসে পড়েছি। তবু তুমি আমায় কিছু বলবে না? ঘৃণা—অবজ্ঞা, যা আমার প্রাপ্য তাই আমায় দাও—

কান্নায় ঊষা ভেঙে পড়ল।

দেবাশীষ গাঢ়স্বরে বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝছো। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, আমি আসছি। এখুনি আসছি।

দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট-পনেরো পরে বাংলোয় ফিরে এল দেবাশীষ। জীপ থেকে নেমেই জানকীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন-মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কি হয়েছে?

—মেমসাহেব বেরিয়ে গেলেন। আমার মানা শুনলেন না।

দেবাশীষের মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ল যেন।

—কোন্ দিকে গেছে?

হাত দিয়ে দিক দেখিয়ে দিল জানকী। তার মানে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে গেছে। দেবাশীষ নেমে এল রাস্তায়। দৌড়ে কিছুদূর যাবার পরই দেখতে পেল ঊষাকে। চলার বেগ আরো দ্রুত করে পৌঁছল তার কাছে।

—কোথায় যাচ্ছো?

—কেন তুমি এলে? আমায় যেতে দাও।

—ছেলেমানুষী করো না। ফিরে চল।

—তোমার জীবন দুর্বিষহ করতে চাই না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার করতে দাও!

—কিসের পাপ?

—তার···কিন্তু যে আসছে···?

—তার কথা কি আমি না ভেবেছি! মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত পরিচয়, তার চাই বইকি! আমার পরিচয়ই তার পরিচয় হবে, ঊষা।

—তুমি—তুমি বলছো একথা ?

—আমি ছাড়া কে বলবে ? তাই তো ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম জেনে নিতে, তাঁর কোন জানাশুনা নার্সিং হোম আছে কি না। যেখানে তুমি পরম স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নবাগতটির জন্য অপেক্ষা করবে।

ঊষা আর কিছু বলতে পারে না, আর কিছু শুনতেও তার সাহস হয় না।

পরম নির্ভরতার সঙ্গে সে দেবাশীষের বুকে মুখ রাখে—তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সুখা বেশে তার চোখ দুটি বারে বারে বন্ধ হয়ে আসে।

তারপর হাত ধরাধরি করে দু'জনে ফিরে চলে বাংলোর দিকে।

——